লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টম সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

অষ্টম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

সম্পাদনা পরিষদ

এ. কে. এম. নাসিরুল হক
কাজী শামসুল আলম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক ঃ আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

© ১৪০৩
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১৫-২০ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা–৩০/বাজা- ৮/৯৬
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.8, March 1997, Chaitra 1403

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : A. K. M. Mahbubuzzaman

© 1403
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka.

Telephone	:	831715-20 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
Fax	:	9332016
BPATC	:	Pub-30/BJ-7/96
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টম সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	উপাত্তের উৎস, শুমারী ও নমুনা জরিপ এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা **ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান**	১
২.	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ **মুহাম্মদ আবদুল কাদের**	১৭
৩.	জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অবদান ঃ প্রাচীন কাল **আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান**	৩৫
৪.	পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, আধুনিক প্রযুক্তি ও মূল্যবোধ ঃ প্রসঙ্গ-বাংলাদেশ **ডঃ শেখ আবদুস সালাম** **আবু জাফর মোঃ শফিউল আলম**	৪৩
৫.	প্রশিক্ষণ-মূল্যায়ন ঃ পরিধি, পদ্ধতি ও কৌশল **মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা**	৫৩
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ ও নির্বাচন ঃ একটি পর্যালোচনা **খন্দকার নাইমুল ইসলাম**	৬৭
৭.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশ চর্চা প্রসঙ্গ **মোঃ সিরাজুল ইসলাম**	৮৯
৮.	নগরায়নের সমস্যা **মোঃ হাসিবুর রহমান**	১১১
৯.	বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা **গোলাম মোস্তাকীম**	১২১

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮-ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

উপাত্তের উৎস, শুমারী ও নমুনা জরিপ এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান *

১.০ সংগ্রহের উৎস হিসেবে উপাত্তের বিভাজন

উপাত্ত দুই ধরনের উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে ঃ প্রাথমিক (Primary) উৎস ও মাধ্যমিক (Secondary) উৎস। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে সনাক্ত করা হয় এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে সংকলিত (Compiled) উপাত্তকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলা হয়। একজন গবেষক কোন মৌলিক অনুসন্ধানের নিমিত্তে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করলে তা প্রাথমিক উপাত্তের পর্যায়ে পড়ে। প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্ত তাই ধরা হয় যে, পূর্বের কোন প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত পুস্তক বা গবেষণা রিপোর্টে নেই। সাধারণত উপাত্ত চয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করার পরই মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিবন্ধীকরণের সময় কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীরা একটি প্রশ্নগুচ্ছ পুরণ করে থাকেন। এই প্রশ্নগুচ্ছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর; যেমন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর প্রাপ্ত উপাত্ত বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে। জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ এই উপাত্ত থেকে যদি কোন গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চান, তবে এই উপাত্ত জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া উপাত্ত হিসেবে স্বীকৃত হবে। প্রাথমিক উৎসের উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহারকারী একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। মাধ্যমিক উৎসের উপাত্ত সংগ্রহকারী ও ব্যবহাকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা হয়ে থাকে।

২.০ বাংলাদেশে মাধ্যমিক উপাত্তের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, আধা সরকারী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত উপাত্ত মাসিক, ত্রৈমাসিক অথবা বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

* সদস্য, পরিচালন পরিষদ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সূত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান বর্ষ-গ্রন্থ বের করে। তাছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কোন কোন ক্ষেত্রে শুমারী ও নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমেও প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে-পরিসংখ্যান পকেট বই, জেলা পরিসংখ্যান ও সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ও চারটি মাসিক প্রকাশনা; যথাঃ পরিসংখ্যান বুলেটিন, অর্থনৈতিক ইন্ডিকেটর, অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান।

৩.০ বিভিন্ন মন্ত্রণাণয় এবং সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশনা সংস্থা ভিত্তিতে নিচে দেয়া হলঃ

সংস্থা/মন্ত্রণালয়	মূল কার্য
রাজস্ব বোর্ড	কর পরিসংখ্যান, শুল্ক (Customs) কর, ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং মওজুদ (Inventory) এর হিসাব।
বাংলাদেশ ব্যাংক	মুদ্রা ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যথা সংকীর্ণ (Narrow) এবং স্ফীত (Broadd) মুদ্রার প্রবাহ, সুদের হার সংক্রান্ত্র তথ্যাদি, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ও ব্যবহার এবং সিডিউল ব্যাংকের কার্যাবলীর মূল্যায়ন। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাব, মুদ্রানীতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।
পাট মন্ত্রণালয় কৃষি বিপণন বা মার্কেটিং পরিদপ্তর	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান। কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর
ব্যানবেইস, (বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যুরো)	শিক্ষা সংক্রান্ত
খাদ্য মন্ত্রণালয়	রেশনিং এর পরিসখ্যান, খাদ্য আমদানী এবং সরকারী পর্যায়ে সংগ্রহকরণ এবং খাদ্য মওজুদ এর উপর পরিসংখ্যান।
শ্রম মন্ত্রণালয়	শ্রম শক্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ এবং বিদেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের চাকরির উপর যাবতীয় পরিসংখ্যান।

এই সব সংস্থা ও মন্ত্রণালয় ছাড়াও মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়,কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, চা বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বহিঃসম্পদ বিভাগ থেকেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪.০ সমগ্রক (Population) ও নমুনা (Sample) ঃ

৪.১ পরিসংখ্যান শাস্ত্রে সমগ্রক বলতে সমজাতীয় বস্তু, উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের সমাহার বুঝায়। যেমন-ঢাকা শহর থেকে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার দূরত্বকে দূরত্বের সমগ্রক (Distance Population) বলা যায়। রোবট সমগ্রক বলতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত সমগ্র রোবটকে বুঝে থাকি।

নমুনা সমগ্রকের একটি অংশ যা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত করা হয়। যে পদ্ধতিতে আমরা সমগ্রক থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি তাকে নমুনায়ন বলা হয়। যথাঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে ময়মনসিংহ জেলার জনসংখ্যা চয়ন।

৪.২ গবেষণায় নমুনায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ সাম্প্রতিককালের, যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে নমুনায়নের প্রক্রিয়ার সাথে আমরা বহু পূর্ব থেকেই পরিচিত। আমাদের সত্তা নমুনায়নের আবর্তে প্রচ্ছন্ন। প্রতিটি সত্তাই পিতামাতার প্রজনন কোষের সহস্র সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সম্ভাবনার সমগ্রকের একটি নমুনা। সময়ের সাথে আমাদের সংযোগও একটি নমুনা। মহাকালের অনন্ত সময়ের অতি সংক্ষিপ্ত একটি পরিসরকেই আমরা ধরে রেখেছি।

৪.৩ নমুনায়নের তাত্ত্বিক ধারণা সুষম (Normal) অথবা গস-ল্যাপলেস(Gauss-Laplace) নিবেশনের (Distribution) সাথে "Law of Errors" এর আত্মীকরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। বিষয়টি আলোচনার জন্য 'বয়স' সমগ্রকের কথা ধরা যাক। বিভিন্ন বয়স যোগ করে আমরা মোট পরিসংখ্যান (Frequency) দিয়ে ভাগ করে গড় বয়স (Population parameter) পেতে পারি। এখন আমরা যদি কিছু সংখ্যক বয়স নিয়ে বিভিন্ন নমুনা নির্বাচন করি এবং প্রতিটি নমুনার জন্য গড় (Sample statistic) বের করি, তাহলে কোন নমুনা গড় সমগ্রক গড় থেকে বড় এবং কোন কোন নমুনা গড় সমগ্রক গড় থেকে ছোট হবে। এই গড় সমূহকে পরিসংখ্যান নিবেশনে (Frequency distribution) সাজিয়ে নিলে তা সুষম নিবেশনের (Normal distribution) প্রকৃতি নিয়ে থাকে। সেখান থেকে সমগ্রকের গড়ের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নেয়া যেতে পারে।

৪.৪ উনবিংশ শতাব্দিতে উপাত্ত সংগ্রহে প্রধানত শুমারী প্রথাই প্রচলিত ছিল। এ, এন কাইয়ার ১৮৯৫ সালে নরওয়েতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানের সুধী সমাবেশে নমুনায়নের প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির (Representative Method) সবল দিকগুলো প্রথমবারের মত তুলে ধরেন। ১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যানে প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ এর উপর একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৩৪ সনের রিপোর্টে উক্ত কমিটি উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive sampling) ও সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন (Probability sampling) কে প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ১৯৩০ এর মাঝামাঝি পর্যন্তও নমুনায়নের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়নি। জনগণ অথবা কংগ্রেস কেউই নমুনায়নের ধারণাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেনি।

"A Common view of that time was that others could take such risks with loose methods and thereby undermind the basis for confidence in their data, but not the Census Bureau"

৪.৫ ভারতবর্ষে পি, সি, মহলানবীশ এবং তার ঘনিষ্ট সহযোগী আর, এ, ফিসার ১৯৪৩ সালে প্রথম উদ্ভাবন মূলক নমুনায়নের মাধ্যমে সেকালের পূর্ববঙ্গে মোট পাট চাষের ভূমি এবং প্রতি একরে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ নিরুপণের মাধ্যমে নমুনায়নের সাফল্য এবং সম্ভাবনা তুলে ধরেন।

" To Judge the success (or otherwise) of the scheme the Jute Census Committee had laid down three tests. The reliability of the sample survey must be such that the margin of error of the final estimate of the area under jute should not exceed 5 percent; secondly, the results must be available sufficiently early in the jute season and preferably by the first or second week of September, and finally the cost of the sample survey shoud not be excessive... the sample estimate of 1941 agreed within 2.8 per cent of an entirely independent official estimate based on a complete detailed census ..(it) was submitted to Government on 27 August... The cost of a sample survey was estimated at about £8.500 against an expenditure of about £110.000 for a complete census."

৫.০ নমুনা ছক, নমুনা একক এবং জরিপ পদ্ধতি

৫.১ সমগ্রকের প্রতিটি অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশকে সুসংবদ্ধ সারিতে বিন্যাস করাকে নমুনা ছক (Sampling frame) বলা হয় এবং নমুনায়নের জন্য যে এককগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয় তার প্রতিটিকে নমুনা একক (Sample Unit) বলা হয়। সমগ্রকের প্রতিটি এককের ওপর তথ্য সংগ্রহ করাকে শুমারী (Census/complete enumeration) এবং একটি উপ-অংশের ওপর উপাত্ত সংগ্রহ করাকে নমুনা জরিপ (Sample Survey) বলা হয়ে থাকে। নমুনা জরিপে আরোহ (Induction) পদ্ধতিতে সমগ্রকের কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উপর ধারণা সম্ভাবনার সাথে নেয়া হয়ে থাকে। শুমারী বা পূর্ণ গণনা (Total count) বিভিন্ন কারণে সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প পন্থা হিসেবে নমুনা জরিপের পদক্ষেপ নিতে হয়। নমুনা জরিপের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা প্রয়োজন :

১। নমুনা জরিপের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নমুনা জরিপের পরিধি ব্যাপক এবং লক্ষ্য সমন্ধে সুষ্ট ধারণা না থাকলে অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কারণে সময় ও অর্থের অপচয় হবে।

২। সমগ্রক (যা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে) সংজ্ঞায়িতকরণঃ যেমন আয় বলতে কি বুঝায় এবং আয়ের কোন্ কোন্ উৎস বিবেচনায় আসবে, সঞ্চয়ের সংজ্ঞা কি? ইত্যাদি।

৩। নমুনা ছক প্রস্তুতকরণঃ নমুনা সাধারণত নমুনা একক (Sampling Unit) নির্বাচনের মাধ্যমে চয়ন করা হয়ে থাকে। নমুনা একক জেলা, খানা (Holdings), জমি অথবা অন্য আর কিছু হতে পারে। কোন একটি একক নির্বাচন করার জন্য তালিকার (List) প্রয়োজন হয়, যা নমুনা ছক নামে পরিচিত। একটি মানচিত্র নমুনা ছক হতে পারে, কারণ মানচিত্রকেও তালিকার সাথে একীভূত করে দেখা যেতে পারে।

৪। প্রশ্নগুচ্ছ প্রস্তুতকরণঃ প্রয়োজন নেই এমন প্রশ্ন না থাকাই ভাল, কারণ প্রশ্নগুচ্ছ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করে সারণী তৈরী করতে হবে, যা উপাত্ত বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

৫। প্রশ্নগুচ্ছের প্রাক পরীক্ষণ (Pre-testing)

৬। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন

৭। নমুনার জন্য সংগৃহীত এককের নির্বাচন প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে সজ্ঞায়িতকরণ

৮। নমুনায়ন তত্ত্বের ব্যবহার

৯। নমুনা বিচ্যুতি (Sampling error) প্রাক্কলনের সম্ভাব্যতা

৫.২ সমগ্রকের (Population) সব ক'টি একক থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে, নমুনায়নে সমগ্রকের একটি অংশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নমুনায়নের মাধ্যমে সমগ্রকের ওপর একটি গ্রহণযোগ্য অনুমান করা যেতে পারে। পদ্ধতিগত উৎকর্ষ লাভের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের (Estimation Formula) ওপর নির্ভর করা হয়। নমুনার মাধ্যমে যে মূল্যমান (Value) পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে সমগ্রকের মূল্যমানে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের সূত্রকে (Formula) এসটিমেটর (Estimator) বলা হয়। সাধারণত সমগ্রকের জন্য (Estimated) সংখ্যা বড় হাতের (Capital letter) এবং নমুনার জন্য হিসাবকৃত সংখ্যা ছোট হাতের (Small letter) হয়ে থাকে। যেমন-সমগ্রকের গড় X , এবং নমুনার গড় x ধরা হয়ে থাকে।

৫.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি ও প্রাক্কলনের প্রেক্ষাপটে নমুনা বিচ্যুতি (Sampling error) নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়। ধরা যাক, একজন পরিসংখ্যানবিদ একই আয়তন (Size) এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বেশ কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করেছেন। যে কোন চলক (Variable) এর জন্য একটি বিশেষ নমুনা থেকে একটি প্রাক্কলন (Estimate) পাওয়া যাবে, যা স্বভাবতই নমুনা থেকে নমুনায় ভিন্ন হতে পারে। এভাবে বিভিন্ন নমুনা থেকে সংগৃহীত প্রাক্কলনের গড় সমগ্রকের গড় মানের সমান হয়, তবে উক্ত প্রাক্কলন অপক্ষপাতমুলক (Non-Sampling bias) বলে চিহ্নিত হবে। বিভিন্ন নমুনা থেকে প্রাক্কলিত মানের ভেদাঙ্ক (Variance) কে নমুনায়ন ভেদাঙ্ক (Sampling variance)বলা হয়।

নমুনায়ন ভেদাঙ্ক ও নমুনাজ মান পক্ষপাতমূলক নমুনা বিচ্যুতির দুটি অংশ হিসেবে স্বীকৃত। বাস্তবিকপক্ষে নমুনা পদ্ধতি এবং প্রাক্কলনের সূত্র এমনভাবে ধরা হয় যাতে নমুনাজ মান পক্ষপাতমূলক শুন্য হয় এবং ব্যয় স্থির রেখে (Constant)নমুনা বিচ্যুতি কমানোর চেষ্টা করা হয়। সে কারণে নমুনা বিচ্যুতি সমগ্রক থেকে প্রাক্কলন না করে নমুনা থেকে প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে নমুনায়নের সাথে অনিশ্চয়তার দিকটিই নমুনা বিচ্যুতির মধ্যে ফুটে উঠে।

৫.৪ স্বাভাবিকভাবেই, নমুনায়নের প্রতিটি একক থেকে তথ্য সংগ্রহ করার মধ্যেও ত্রুটি থেকে যেতে পারে যা অনমুনায়ন (Non-Sampling error) ত্রুটি হিসেবে স্বীকৃত। পর্যবেক্ষণ ত্রুটির মাধ্যমেই এই ভুলগুলি হয়ে থাকে। উত্তরদাতা যথাযথভাবে প্রশ্ন অনুধাবন করতে না পেরে ভুল উত্তর দিয়ে থাকেন। উপাত্ত সংগ্রহকারী (Enumerator) উপাত্ত সংকলনে ভুল করতে পারেন অথবা উপাত্ত প্রতিলিপিকরণে (Transcribe) ও অন্যান্য মানবিক ত্রুটি (Human error) এর কারণে ভুল হতে পারে। নমুনা বিচ্যুতির (Sampling error) মত এই প্রকার ভুলের দৈব অংশ (Random Component) থাকতে পারে। নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি, নমুনার আয়তন এবং সমগ্রকের ভেদাঙ্কের ওপর ধারণা থেকে নমুনা ভেদাঙ্কের ওপর ধারণা করা যেতে পারে। নমুনা বিচ্যুতির ধারণা থেকে নমুনার নকশা প্রণয়ন করা যেতে পারে, যা নমুনায়নে সর্বাধিক (Optimum) উৎকর্ষ নিয়ে আসবে।

৬.০ শুমারী ও নমুনায়নের তুলনামূলক সুবিধা

৬.১ নমুনায়নে উপাত্ত সংগ্রহে নমনীয়তা থাকে। কোন কোন সময় সমগ্রকের প্রতিটি একক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়ের অনেক তথ্যই প্রতিটি খানা (Household) থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে নমুনায়নের ওপরই নির্ভর করতে হয়। শিল্পজাত পণ্যসমূহের উৎকর্ষ সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ (Quality control) নমুনা দ্বারাই সম্ভব।

নমুনায়নে সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়। শুমারীতে প্রতিটি একক থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সে জন্য সময়, অর্থ, লোকবল, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। ফলে খরচ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মোট পাট চাষের জমির পরিমাণ নিরূপণ ও প্রতি একরে পাটের ফলনের ওপর নমুনায়নের খরচ এবং শুমারীর জন্য প্রক্কলিত ব্যয় থেকে এই বিষয়ের ওপর সঠিক ধারণা নেয়া যেতে পারে। শুমারীর ব্যাপ্তি ২-৩ বৎসর মেয়াদী হতে পারে। যেমন-আদম শুমারীর জন্য শুমারী দিনপঞ্জী প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে আদম শুমারীর

জন্য দিনপঞ্জী প্রণয়ন করা হয়েছিল। দিনপঞ্জীটি ১৯৭২ সালের মে মাসে শুরু হয়ে ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে শেষ হয়েছিল। শুমারী অধ্যাদেশ এবং শুমারী কমিশনের পদ সৃষ্টি করা ছাড়াও মুদ্রণ এবং প্রকাশনা পর্যন্ত মোট ৪০টি কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬.২ নমুনা সমীক্ষায় যেহেতু অল্পসংখ্যক একক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সে জন্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিন্যাসে তুলনামূলকভাবে শুমারী থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। নমুনা সমীক্ষার জন্য উপাত্ত সংগ্রহে মাঠ পর্যায়ে অধিকতর দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা যায়। তাছাড়া অশিক্ষা ও মূল্যবোধের সংকীর্ণতার কারণে শুমারী জরিপে অনেক সময় উত্তরদাতার নিকট থেকে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

শুমারী জরিপে নিয়মিত পর্যকৃতি (Periodicity) থাকে অর্থাৎ নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর শুমারী জরিপ করা প্রয়োজন হয়। লোকসংখ্যা কার্যক্রম সাধারণত প্রতি ১০ বৎসর অন্তর গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শুমারী জরিপের মূল বৈশিষ্ট্য যুগপত্তা (Simultaneity) যা সার্বিক গণনা (Big count) হিসেবে আদম শুমারীর জন্য প্রণীত দিনপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়। এই গণনা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন অন্যথায় কোন কোন একক দু'বার গণনায় আসতে পারে। আবার কোন কোন একক সম্পূর্ণভাবে বাদও পড়তে পারে। এই কারণে শুমারীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বহুসংখ্যক গণনাকারী ও তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে শুমারী জরিপের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৭.০ নমুনায়নের পদ্ধতি

৭.১ নমুনায়নে দু'রকমের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন (Probability Sampling) এবং উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Smpling)।

৭.২ সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন ঃ সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নে প্রতিটি এককের নমুনায়নে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সমান করার জন্য নমুনা ছক তৈরী করা হয়। প্রতিটি নমুনা এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সম এবং ধনাত্মক। নমুনা থেকে সমগ্রকের ওপর ধারণা, নমুনা বিচ্যুতির প্রাক্কলন এবং নমুনায়নের সর্বাধিক (Optimum) উৎকর্ষ নমুনায়নের তাত্ত্বিক রূপরেখার ওপর নির্ভর করে।

৭.৩ উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নঃ এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহকারী নমুনা একক সংগ্রহ করার সময় কোন বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। ঘটনা সমীক্ষা (Case study) ও কোটা নমুনায়ন (Quota sampling) এই পর্যায়ভুক্ত।

৭.৪ দৈবচয়ন (Random sampling) কোন কোন সময় সুস্পষ্টভাবেই একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনায়ন নাও এনে দিতে পারে এবং উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন এই

ধরনের ঝুঁকি কমিয়ে নিয়ে আসবে। ধরা যাক যে, নমুনায়নের নির্ধারিত স্থানটি একটি দীর্ঘ আকৃতির বনাঞ্চল (Terrian) এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটি প্রান্তে তুলনামূলক বেশী, অপর একপ্রান্তে তুলনামূলক কম এবং মধ্য অঞ্চলে মাঝামাঝি। মনে করা যাক, প্রতিটি এলাকায় এক তৃতীয়াংশ লোকের বাস। দৈব নমুনায়নের একক হিসেবে তুলনামূলক বেশী বৃষ্টিপাতের এলাকা এসে যেতে পারে, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নে এ ধরনের ত্রুটি থাকবে না। এ রকমের অবস্থার জন্য স্তরিত নমুনায়ন (Stratifed sampling) করা হয়ে থাকে। স্তরিতায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহকারী নমুনায়নের পূর্বেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এলাকাটিকে তিনটি ভাগ করবেন। নমুনা সংগ্রহকারী একটি স্তর থেকে একটি নমুনা একক সংগ্রহ করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহকারী সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নের নীতি প্রণয়ন করেই উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেন। তবে নমুনা যে সব সময় প্রতিনিধিত্বমূলক হবে তা বলা যায় না। নমুনা এবং সমগ্রকের গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। এই পার্থক্য আংশিকভাবে নমুনা বিচ্যুতির (Sampling error) কারণ হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নের মত বিচ্ছিন্ন একটি একককে কখনই বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে সংগ্রহকারী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অথবা বিশেষ কতগুলো নিয়ম (Norm) অনুসরণ করে যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। এ ধরনের নমুনায়নে সম্ভাবনা তত্ত্বের (Probablity theory) কোন প্রয়োগ নেই এবং পক্ষপাতিত্বের কারণে নমুনার প্রতিনিধিত্বমূলক ধর্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নকে সিদ্ধান্ত নমুনায়নও (Judgement Sampling) বলা হয়ে থাকে।

৭.৫ সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নে ঝুঁকির ব্যপ্তি জানা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থানের মাধ্যমে এই ঝুঁকি ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়ে আসা যায়। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকি (Risk) খুবই বড় এবং একই সাথে মূল্যায়নে কাজটি কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ভ্রান্ত ধারণা দিতে পারে। তথাপি কোন কোন সময় তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন উপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ, স্পল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে জটিল বিষয়ের অনুসন্ধান করার কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে।

৮.০ সম্ভাবনা নির্ভর নমূনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি

(ক) **দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়ন (Random sampling)ঃ** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় চারটি কার্যক্রম রয়েছে।

(১) একটি পূর্ণাঙ্গ নমুনা ছক প্রণয়ন,

(২) প্রতিটি একককে সংখ্যায়িতকরণ,

(৩) নমুনার আয়তন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ,

(৪) দৈবচয়িত সংখ্যা সারণীর (Random Number Table) মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনা একক বেছে নেয়া।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে দৈবচয়ন পদ্ধতির কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হল। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি ছককে নমুনা ছকের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ছকে শ্রেণীকক্ষের মোট ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর ক্রমিক নম্বর ১০১ থেকে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যায়িত করা হয়েছে (সারণী-১)।

সারণী-১

নমুনা ছকের মাধ্যমে দৈবচয়িত ও নিয়মক্রমিক নমুনায়ন

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দৈবচয়িত	নিয়মক্রমিক
১০১	মুজতাবা রিজওয়ান	সহকারী সচিব	***	
১০২	মোঃ আব্দুল মতিন	সহকারী জজ		$ $ $
১০৩	মোঃ মোতাহের আলী	সহকারী জজ		
১০৪	মোঃ হুমায়ুন কবির	সহকারী কমিশনার		
১০৫	নমিতা হালদার	সহকারী কমিশনার		
১০৬	মোঃ আসাদুল ইসলাম	সহকারী সচিব		$ $ $
১০৭	মোঃ রফিক উদ্দিন	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট		
১০৮	মোঃ আজহারুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার		
১০৯	মোঃ আলমগীর হোসেন	সহঃ কর কমিশনার		
১১০	কাজী ওবায়দুর রহমান	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১১১	মোঃ শেফাউল করিম	সহকারী কমিশনার	***	
১১২	পবন চৌধুরী	সহকারী কমিশনার	***	
১১৩	মোহাম্মদ রেজাউল হক	সহকারী কমিশনার		
১১৪	মোঃ আবু তালেব	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১১৫	এম, হাছানুজ্জামান	সহকারী জজ		
১১৬	মোঃ গোলজার হোসেন	সহকারী কমিশনার		
১১৭	হুমায়রা এ, আর, খান	গবেষণা কর্মকর্তা		
১১৮	হাসান মাহমুদ	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১১৯	শামস আল মুযাদ্দিদ	সহকারী কমিশনার	***	
১২০	সুভাষ চন্দ্র সরকার	সহকারী কমিশনার		
১২১	মোঃ আব্দুল মান্নান	সহকারী কমিশনার		

১২২	মোঃ জাকির হোসেন	সহকারী জজ		$ $ $
১২৩	হাসিনা আলম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা		
১২৪	শাহরিন আফরোজ	সহকারী কমিশনার		
১২৫	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	সহকারী কমিশনার		
১২৬	মোঃ হাছানুর রহমান	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১২৭	মোস্তফা কামাল	সহকারী কমিশনার		
১২৮	রওশন আলা বেগম	সহকারী কমিশনার		
১২৯	মোহাম্মদ আবু ইউসুফ	সহকারী কমিশনার	***	
১৩০	শাহেদ ইকবাল	সহকারী কমিশনার	***	$ $ $
১৩১	প্রণব চন্দ্র রায়	বেতার প্রকৌশলী		
১৩২	চৌধুরী মোফাদ আহমদ	সহকারী কমিশনার	***	
১৩৩	মোঃ সিরাজুল হায়দার	সহকারী কমিশনার		
১৩৪	কাজী মেরাজ হোসেন	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১৩৫	মোঃ আব্দুল আহাদ	সহাকরী কমিশনার		
১৩৬	তপন কুমার ঘোষ	সহকারী কমিশনার	***	
১৩৭	মোঃ নুরুল আমিন	সহকারী কমিশনার	***	
১৩৮	মোঃ মফিজুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার	***	$ $ $
১৩৯	মোঃ ফজলুল বারী	গবেষণা কর্মকর্তা		
১৪০	মোঃ হামিদুর রহমান	সহকারী কমিশনার		
১৪১	মিজানুর রহমান	সহঃ কর কমিশনার		
১৪২	মোঃ ফারুক হোসেন	সহকারী সচিব		$ $ $
১৪৩	জ্যোতিরময় দত্ত	সহকারী কমিশনার	***	
১৪৪	সোলতানু আহমদ	সহকারী কমিশনার		
১৪৫	নারায়ন চন্দ্র দাস	সহকারী কমিশনার		
১৪৬	আকবর হোসেন	সহকারী কমিশনার		$ $ $
১৪৭	অমৃত বাড়ই	সহকারী কমিশনার		
১৪৮	মোঃ সাজ্জাদ কবির	সহকারী কমিশনার	***	
১৪৯	সৈয়দ সাব্বির আহম্মেদ	সহকারী কমিশনার		
১৫০	মোঃ আব্দুল হাই	গবেষণা কর্মকর্তা	***	$ $ $

এই ৫০জনের মধ্য থেকে যে কোন ১৩জনকে নির্বাচন করার জন্য আমাদের ১৩টি সংখ্যা দৈবচয়িত সংখ্যা সারণী থেকে বেছে নিতে হবে।

সারণী-২
(দৈবচয়িত সংখ্যা প্রকাশ করছে)

৭৪৬০৫	৬০৮৬৬	৯২৯৪১	৭৭৪২২	৭৮৩০৮	০৮২৭৪	৬২০৯৯
২০৭৪৯	৭৮৪৭০	৯৪১৫৭	৮৩২৬৬	৩৭৫৭০	৬৪৮২৭	৯৪০৬৭
৮৮৭৯০	৭৯৯২৭	৪৮১৩৫	৪৬২৯৩	০৫০৪৫	৭০৩৯৩	৮০৯১৫
৬৪৮১৯	৭৩৯৬৭	৭৮৯০৭	৫০৯৪০	৯৮১৪৬	৮০৬৩৭	৫০৯১৭
৫৫৯৩৮	৭৮৭৯০	০৪৯৯৯	৩২৫৬১	৯২১২৮	৮৩৪০৩	৭৯৯৩০
৬৬৮৫৩	৩৯০১৭	৮২৮৪৩	২৬২২৭	২৫৯৯২	৬৯১৫৪	৩৮৩৪১
৪৬৭৯৫	২১২১০	৪৮২৫২	৫১৪৫১	৪৭১৯৬	২৭৯৭৮	৪৯৪৯৯
৯৫৬০১	৩৬৪৫৭	৩৪২৩৭	৯৮৫৫৪	৪৬১৭৮	৪৪৯৯১	৪৩৬৭২
৯৮৭২১	৪৪৫০৬	৩৭৫৮৬	৬৭২৫৬	৮৮০৯৪	৫১৮৬৯	৪৩০০৮
৬১৩০৭	১২৯৪৭	৪৩৩৮৩	৩৪৪৫০	৬২১০৩	০৫০৪৭	১৫৬১৪
৩৭৭৮৮	০১০৯৭	১৫০১০	৯৭৮১১	২৭৩৭২	৮১৯৯৪	৬০৪৫৭
৩৬১৮৬	৬৬১১৮	৯০১২২	৪৫৬০৩	৯৪০৪৫	৬৬৬১১	৬৯২০২
৯৬৭৩০	১৩৬৬৩	১৪৩৮৩	৫১১৬২	৫০১১০	১৬৫৯৭	৬২১২২
৯৮৮৩১	৩১০৬৬	২১৫২৯	০১১০২	২৮২০৯	০৭৬২১	৫৬০০৪
৩৫৪৫০	২৪৪১০	৮৮৯৩৫	৮৪৪৭১	৪৬০৭৬	৬০৪১৬	১০০০৭
৯২০৩১	৪২৩৩৪	২৭২২৪	০৯৭৯০	৫৯১৮১	৬৬৯৫৮	৯১৯৬৭
০২৮৬৩	১৬৬৭৮	৪৫৩৩৫	৭২৭৮৩	৫০০৯৬	৫২৫৮১	১৫২১৪
৮০৩৬০	৮৯৬২৮	৪৭৮৬৩	২১২১৭	৬২৭৯৭	১১২৮৫	৪২৯৩৮
৫৮১৯৩	১৬০৪৫	৭২০২১	৯৩৪৪৯৬	৯৯১২০	৩৬৫৪২	৪১৯৮৭
৬৬০৪৮	৯৫৬৪৮	৯৪৯৬০	৫৮২৯৪	০৭৯৮৪	৮৭৩২১	২৩৯১৯
৬৪০১৩	০৮৫৪৬	২৭৭৭৯	২৩৫০০	৯৫২১৬	০২৬৫৭	০০৫০৭
১৬৯৫৪	৮১৭৫৪	৯৯০৩৩	৫২৮৪১	৭০০১০	৩৬২৬৪	০০৪৫৬
৫৪৬৭৮	৫৯৫৩১	৪৮৬৯২	৫৪১৬০	১১৯১৩	১৬১২১	৯০০২৩
৪২৬৪৫	৯৮২৯৫	২৬৬৬৯	৮২১৯৯	৮৪৮৯০	৬৩১০০	৬২০১৭
৬৬১৬৮	৪৪৬৩৩	৭৩০৬৮	৫৫২১৬	৬১৮৯৬	৮৩৯৬৯	০৫৩২৭
২০৬৪৭	০১০৬১	১৮২২৭	২০১৯৫	৩৮২২১	০৫৭৬৭	৬৩৩৩১
৩০৮০৭	৯৩৮৩৭	৪২২১০	৮১৯০৮	৪১৭২৯	৮৬৪১৬	০৪৫৭৯
৫১৯৪৯	৪১৩৬১	৩৫৬৩২	০৬৬৯৬	৫৭৮৭৫	৯৭১৯৬	৭৩৬২৫
৮২২৮৩	৪৬৫৯১	৪৩০৫৭	৯১৩৯০	৬০০৫১	১৩২৯৭	১১১৪৯
৪৯৪৯৭	০০০৫৩	৭৮৫১৩	৫৪৩৮১	৮৮৮৯৮	০৩৪১৮	০৬৮১০
৭৮৫১৯	৮৮০৮৫	৯৪১১৯	১৯৪২২	৮৬৫৪৬	৪৭৯৩৯	১৪৮৭৮
১৩০২৭	৪২৭৭৭	৯৩৫৬৩	৯১২৫৩	৮১৮৬৭	৭০৩৪৪	৪৪৪১৭
০৪৭৩৪	২৭৪১৯	৭২০৬৫	২৩৩৯০	১৩৭৮৯	৮৫৯৪৩	০০৩৭৪
৭৮৯৯৯	৬৩৪৭০	২৪১৭৪	৫০৬৯৫	৫৩৯৩১	৮৫৪৫২	০২৪৯০

৫১৮৯১	১৯৮৭৩	৫৩২২০	২৭৫৮৫	৩৮৪৫৭	৪৬৫৫৩	৭৬৫৮৫
৬৪৯২৯	১৩৬৩২	৬৬৭৬	৯৯৩৩৪	৭৫৩২৬	৬৯৮১০	৪৩৮৯৩
৩০৩১৯	৬৭৫৮৯	০০০১৩	২৩৩০১	৩৭৩১৪	২২৯০৫	<u>১৩৮৮৭</u>
<u>১৩৭৬১</u>	০৫৫৬১	<u>১০১১৩</u>	৮৯৯৪৬	৫৭০১৭	৪৫৭৯৭	৫০৮৬৮
৭৯১৮০	৪৪০১১	৩৮০৬৭	৯৯৮০২	৫৩৪৯০	১৮৫৯০	১৮৮১৮
৮৫৩০৪	৮৫৬৮১	৮৭৮২৫	৪৬২৬২	৮৪৭৪৮	৯৪৫৬৮	৫৬৬০৪

Source : D. A. de Vaus, Surveys in Social Research, George Allen & Unwin, London, 1986, p.55.

যেহেতু বৃহত্তম সনাক্তকৃত সংখ্যাটি তিন্ অংকের, আমাদের তিন অংকের ১৩টি সংখ্যা দৈবচয়িত সংখ্যা সারণী থেকে নির্ধারণ করতে হবে। সারণীতে প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যাই পাঁচ অংকের। তিন অংকের সংখ্যা সনাক্ত করার জন্য একই সাথে তিনটি অংক বিবেচনা করতে হবে। অতপর এই সারণীর কোন্ অংশ থেকে গণনা শুরু করবেন তা সনাক্ত করতে হবে। ধরা যাক, দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রথম কলাম এবং দ্বিতীয় সারি এসেছে। এখানে প্রাপ্ত সংখ্যা ২০৭৪৯। প্রথম তিনটি অংক নমুনার একক সনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হলে ২০৭ ক্রমিক সংখ্যা একটি নমুনা একক হিসেবে আসবে। কিন্তু ২০৭ ক্রমিক সংখ্যা নমুনা ছকের মধ্যে নেই। সে জন্য ২০৭ ক্রমিক সংখ্যা গ্রহণ করা যাবে না। এখন প্রথম কলামের প্রতিটি সারির প্রথম তিনটি অংককে পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করি। প্রথম কলামে ১০১-১৫০ ক্রমিক সংখ্যার মধ্যে প্রাপ্ত নমুনা একক হবে, ১৩০,১৩৭। দ্বিতীয় কলামে প্রাপ্ত নমুনা একক ১২৯, ১৩৬। তৃতীয় কলামে প্রাপ্ত নমুনা একক, ১৫০, ১৪৩, ১০১। চতুর্থ কলামে নমুনা একক নেই। পঞ্চম কলামে নমুনা একক ১১৯, ৬ষ্ঠ কলামে নমুনা একক ১১২, ১৩২ এবং সপ্তম কলামে নমুনা একক ১১১, ১৪৮, ১৩৮। প্রাপ্ত একক সমূহকে "***" চিহ্ন দিয়ে নমুনা ছকে সনাক্ত করা হল।

(খ) নিয়মক্রমিক নমুনায়ন (Systematic Sampling)

নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন দৈবচয়িত নমুনায়ন থেকে তুলনামূলকভাবে সহজ। এখানে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রথম একককে সনাক্ত করা হয় এবং পরবর্তী এককসমূহ একটি নির্ধারিত ব্যবধানে নির্বাচিত করা হয়। নমুনার আয়তন স্থির করার পর নমুনা ভগ্নাংশ (Sampling Fraction) বের করতে হবে। ৫০ একক বিশিষ্ট সমগ্রক থেকে ১৩টি নমুনা সংগ্রহ করতে হলে নমুনা ভগ্নাংশ আনুমানিক ১:৪। এখন প্রথম ৪টি নমুনা একক থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনায়নের প্রথম একক নির্বাচন করতে হবে। মনে করা যাক, দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রথম স্থিরকৃত একক ১০২, তাহলে পরবর্তী এককগুলো হবে ১০৬তম, ১১০তম, ১১৪তম, ১১৮তম, ১২২তম, ১২৬তম, ১৩০তম, ১৩৪তম, ১৩৮তম, ১৪২তম, ১৪৬তম, ১৫০তম। সারণী-১ এ $ $ $ চিহ্নের মাধ্যমে এককসমূহ সনাক্ত করা হয়েছে। নিয়ম ক্রমিক

নমুনায়নে নমুনা এককের অবস্থিতি নির্ধারণ করা খুবই সহজ। নমুনা ছকে নমুনা এককের সংখ্যা বেশী হলে নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন পদ্ধতি সুবিধাজনক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে সমগ্রকের তালিকাভুক্তিকরণের সময় যদি একটি সুনির্দিষ্ট পর্যকৃতি (Periodicity) পরিলক্ষিত হয় তবে নমুনা একক নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা পাওয়া যাবে না।

(গ) স্তরিত নমুনায়ন (Stratified Sampling)

স্তরিত নমুনায়ন আপাত দৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও প্রতিনিধিত্বমূলক-নমুনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ স্বীকার্য। মনে করা যাক, দৈবচয়িত নমুনায়নে যে ১৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনাক্ত করা হয়েছে তাদের সকলেই প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত। নমুনা ছকে সুনির্দিষ্ট পর্যকৃতি (Periodicity) থাকলে, একক নির্বাচনে এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা পাওয়া যাবে না।

স্তরিত নমুনায়নের জন্য সমগ্রককে কতগুলি স্তরে (Strata) বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ভাগ করে নিতে হবে। এখানে সমগ্রকের ৫০টি একককে ক্যাডার ভিত্তিতে ৫টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর ক্যাডার বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক্যাডার	সমগ্রক	শতকরা	নমুনা	শতকরা
প্রশাসন	২০	৪০	৪	৪০
বিচার	১০	২০	২	২০
সমবায়	১০	২০	২	২০
আনসার	৫	১০	১	১০
অর্থনীতি	৫	১০	১	১০
মোট	৫০	১০০	১০	১০০

বিভাজনের সময় সম ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের একই রাখা হয়েছে যাতে করে সর্বোচ্চ সমসত্ব (Homogeneity) নিয়ে আসা যায়। প্রশাসন ক্যাডারের ২০জন কর্মকর্তা মোট সমগ্রকের শতকরা ৪০ভাগ। নমুনা সংখ্যা ১০ হলে আনুপাতিক হারে ৪জন কর্মকর্তা প্রশাসন ক্যাডার থেকে আসতে পারেন। এই ৪জন কর্মকর্তার নির্বাচন অবশ্যই দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। অন্যান্য ক্যাডার যথা-বিচার, সমবায়, আনসার ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে নমুনা একক সংগ্রহ করার সময় দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমেই করতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে স্তরিত নমুনায়নের আনুপাতিক বিন্যাস (Proportionate allocation) বলা হয়।

(ঘ) গুচ্ছ চয়নে স্তরিত চয়নের মতই সমগ্রককে কতগুলো গুচ্ছে বিভাজন করা হয়। গুচ্ছে বিভাজন করার সময় একই গুচ্ছের মধ্যে এককসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অসমসত্ত্ব থাকবে। গুচ্ছের মধ্যে আনুপাতিক হারে সকল ক্যাডারেরই প্রশিক্ষণার্থী থাকবে। সে জন্য গুচ্ছায়নে প্রতিটি গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত এককগুলের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার অসমসত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় এবং এক গুচ্ছ থেকে অপর গুচ্ছের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার সমসত্ত্ব বিদ্যমান থাকে। গুচ্ছ চয়নে একটি গুচ্ছকে নমুনা একক হিসেবে ধরে নিয়ে নমুনার প্রতিনিধিত্বও ঠিক থাকে। ব্যয় কমানোর জন্য ক্ষেত্র নমুনায়ন (Area Sampling) এর ক্ষেত্রে গুচ্ছ চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে গুচ্ছের আয়তন খুব বেশী হলে নমুনা বিচ্যুতি বেড়ে যেতে পারে।

(ঙ) বহু পর্যায়ী নমুনায়ন

বহু পর্যায়ী নমুনায়নে সরাসরি নমুনা একক সংগ্রহ না করে বিভিন্ন পর্যায়ী নমুনা একক নির্বাচন করা হয়। গুচ্ছ চয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নমুনায়নে বহু পর্যায়ী নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন একটি দেশকে কতগুলো প্রশাসনিক জেলাতে ভাগ করা যেতে পারে। এখানে জেলাসমূহের তালিকা প্রথম পর্যায়ের নমুনা ছক হিসেবে চিহ্নিত হবে। দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকটি জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জেলাসমুহ থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে থানা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত থানা থেকে তৃতীয় পর্যায়ে কতগুলো ইউনিয়ন দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করা যেতে পারে এবং চতুর্থ পর্যায়ে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহ থেকে কয়েকটি গ্রাম চূড়ান্তভাবে বেছে নেয়া যায়। বহু পর্যায়ী নমুনায়নে প্রশাসনিক জটিলতা এবং অর্থ ব্যয় কম হলেও নমুনা বিচ্যুতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যেতে পারে। কারণ বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত নমুনা সংগ্রহে একটি পর্যায়ের নমুনা বিচ্যুতি অন্য পর্যায়ের নমুনা বিচ্যুতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

৯.০ নমুনা আয়তন

নমুনার আয়তন যতই বড় হবে, নমুনা বিচ্যুতি তুলনামূলকভাবে ততই কমে আসবে। সাধারণভাবে নমুনা বিচ্যুতি ও নমুনা আয়তনের সম্পর্ক বর্গমূলের (Square root) মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। নমুনা বিচ্যুতিকে অর্ধেকে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য নমুনার আয়তন চারগুণ বাড়াতে হবে। আবার নমুনা বিচ্যুতি শুধুমাত্র নমুনা আয়তনের ওপরই নির্ভর করে না, নমুনা নকশার (Design) ওপরও নির্ভর করে। বহুস্তর নমুনায়ন প্রক্রিয়া নমুনা বিচ্যুতি বাড়িয়ে দেয়, স্তরীকরণ প্রক্রিয়া নমুনা বিচ্যুতি কমিয়ে নিয়ে আসে।

নমুনা বিচ্যুতি শুধুমাত্র নমুনার ওপরই নির্ভর করে না, সমগ্রকের প্রকৃতি নমুনা বিচ্যুতিকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি সমগ্রকের এককসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান খুব বেশী হয়, নমুনা বিচ্যুতি বেশী হবে। যদি সমগ্রকের প্রতিটি একক

সমান হয়, তা হলে নমুনা বিচ্যুতি শূন্য হবে এবং শুধুমাত্র একটি একক নিয়ে চয়নকৃত নমুনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ধারণা দেবার জন্যই পর্যাপ্ত হবে।

ইপ্সিত (Deservable) নমুনা আয়তন তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ঃ

(ক) সংগৃহীত নমুনার জন্য নির্ভুলতার মাত্রা।

(খ) নমুনা থেকে সমগ্রকের যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হবে, সমগ্রকে তার বিস্তৃতির (Variation) ওপর সুস্পষ্ট ধারণা।

(গ) নমুনার সব থেকে বাঞ্ছনীয় আয়তন নিরূপণের জন্য নমুনা বিচ্যুতির সহনীয় সীমা (Tolarable limit) নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তা ছাড়াও ব্যয় এবং সময়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Vaus, D. A. De. (1986). *Surveys in Social Research,* George Allen & Unwin, London.
2. Casley D. j. and Lury, D. A. (1981). *Data Collection in Developing Countries,* Oxford University Press, Walton Street, Oxford Ox26 DP.
3. Obaidur Rahman Mir, (1989). *Quantitative Analysis, (Mimeo),* Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka.

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ

মুহাম্মদ আবদুল কাদের *

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে "স্থানীয় সরকার" বলতে কি বুঝায় সে সমন্ধে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্য পরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা বিভিন্ন আইন, বিধি, সার্কুলারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিংবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ এর দশকে জি মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর দু'ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায় যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

১.২ চার্লস ব্যরই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়; যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এন সাইক্লোপেডিয়া অব স্যোশ্যাল সায়েন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

"স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে।" জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে"।

১.৩ এ আলোচনায় স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত ঃ

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন;

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা;

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে;

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

২.০ পটভূমি

২.১ প্রাচীনকালে এদেশে বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে মনে করা হয়। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের বিবাদ মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে পূর্ব ভারতে বর্ণপ্রথা শিথিল থাকার কারণে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে প্রায়ই পতিত হতো বলে এখানে দূর্বল ধরনের গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

২.২ মধ্যযুগে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থানের পরে নতুন নতুন ধরনের ও সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুগলরা 'সুবা' এবং 'সরকার' এই দুই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে। সুবার পরিচালক কর্তাকে সুবাদার এবং সরকারের কর্তাকে সিকদার বলা হতো। এ সময় প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগণা হিসেবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরগণায় সুসংবদ্ধ শাসন কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী এবং মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম প্রধান এবং চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীন প্রশাসনের পাশাপাশি কোতোয়াল নিয়োগ করে মিউনিসিপ্যাল ও প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। কাজী নিয়োজিত হতেন বিচার কাজের জন্য। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিটি শহরে "খানকাহ্" এর ব্যবস্থা ছিল।

২.২ বাংলাদেশের আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশ শুরু হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত কতিপয় আইনের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহরাঞ্চলে এবং উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান যে কাঠামো বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত হয় তা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হয়ে বর্তমানকালে প্রণীত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। নিচে কালানুক্রমিক সংশ্লিষ্ট আইনগুলো আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্রমবিকাশের ধারাটি তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

২.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বৃটিশরা এদেশে আগমনের পরে প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণ ওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ হওয়ার পরে এদেশে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয় এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করাসহ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হয়।

২.৪ গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০

লর্ড মেয়ো এর আমলে গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭৯ পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী পাঁচজন সদস্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন করতেন। একটি পঞ্চায়েত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ হতো। সর্বনিম্ন ট্যাক্সের হার ছিল ছয় আনা। যদি কোন পঞ্চায়েত সদস্য তার এলাকার সংশ্লিষ্ট একজন চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতেন তবে তার সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল। পঞ্চায়েত তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক। নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি পঞ্চায়েত সদস্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হতো। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিদ্যমান ছিল ঃ

ক) পঞ্চায়েতের সদস্যরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নন বরং তারা ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা মনোনীত। ফলে তারা একদিকে যেমন জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না তেমনি তারা জন কল্যাণের প্রতি ততটা মনোযোগীও ছিলেন না।

খ) তারা কোন রকম জন কল্যাণমূলক অথবা উন্নয়মূলক কার্যক্রম সরাসরি গ্রহণ করতে পারতেন না।

গ) ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি তথা ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারতেন না।

ঘ) অনেক সময় চৌকিদাররা নিয়মিত বেতন পেতেন না।

ঙ) নিরাপত্তা এবং কর সংগ্রহের নামে জনগণ তাদের পঞ্চায়েতের জুলুম এবং হয়রানীর শিকার হন।

২.৫ বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন -১৮৮৫

স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লর্ড রিপোন কর্তৃক ১৮৮২ সালে উপস্থাপিত রেজুলেশনটি সংশোধিত রূপে ১৮৮৫ সালে বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন হিসেবে পাশ হয়। এ আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান রেখে নিম্নলিখিত তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করা হয় ঃ

১। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল)

২। মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড

৩। জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

২৫.৯০ বর্গ কিলোমিটার হতে ৩৮.৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। এ কমিটির আওতায় এক বা একাধিক গ্রাম থাকতো। ৫ থেকে ৯জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য প্রথমবারের মত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্যরা জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। এ কমিটিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট করা হয়। তাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও কর আদায় ছাড়াও গ্রামের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, জন্ম মৃত্যুর হিসেব রাখা এবং লোকাল বোর্ডের প্রত্যর্পিত কিছু বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমপক্ষে ছয়জন সদস্য নিয়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হতো। লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এর অনুমোদন সাপেক্ষে। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। এ বোর্ড এর অধীনে অধীনস্থ ইউনিয়ন কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল লোকাল বোর্ডের অন্যতম কাজ। জেলা বোর্ড কমপক্ষে নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচিত হতেন তবে প্রাদেশিক সরকার সরাসরিভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতো না। জেলা বোর্ড সরকারী সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ও সরকারী ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মত সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতো।

এই আইনের উল্লেখযোগ্য ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এ আইনে জেলা বোর্ডকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেয়া হয়।

২। ইউনিয়ন বোর্ড ও লোকাল বোর্ড অনেক ব্যাপারেই জেলা বোর্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে স্বাধীনভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

৩। জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত থাকায় নিম্ন পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে জেলা বোর্ড অর্থ সাহায্য দিতে পারতো না।

২.৬ বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ত্বশাসন আইন-১৯১৯

এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার কার্যকর ক্ষমতা এবং অধিকতর স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এই আইনটি প্রবর্তন দ্বারা ১৮৭০ সালে প্রবর্তিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ডের নামে একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল তিন বছর রাখা হয়েছিল, যা ১৯৩৬ সালে চার বছর করা হয়। পূর্বে প্রবর্তিত মহকুমা বোর্ড এবং জেলা বোর্ড ব্যবস্থা এই আইন বলে বহাল রাখা হয়। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ

ক. মোট ৬ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এক তৃতীয়াংশ সদস্য হতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এই সদস্যদের মধ্য হতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য ধার্য করার প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়।

খ. ইউনিয়ন বোর্ডের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়েছিল।

গ. যে সব পুরুষ ২১ বছরের বেশী বয়স্ক এবং যাদের নির্দিস্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাদের প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন অফিসারের উপস্থিতিতে প্রার্থীদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের নাম উচ্চারণ করে ভোট কার্য সমাধা করা হতো।

ঘ. ইউনিয়ন বোর্ডকে ট্যাক্স আরোপ ও ছোট খাটো ফৌজদারী অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। রাস্তাঘাট, পুল, নিরাপত্তা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুবিধা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করা ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ।

ঙ. ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য তদারক ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উন্নয়ন সার্কেল অফিসারের উপর ন্যাস্ত ছিল।

এদিকে এই আইন বলে যে লোকাল বোর্ডের বিধান রাখা হয় তা নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতো। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধনের সেতুবন্ধন হিসেবে এই লোকাল বোর্ড কাজ করতো। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় পরবর্তীকালে লোকাল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই আইনে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। তাছাড়া একজন, কোন কোন ক্ষেত্রে দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হতেন। যে সব পুরুষের বয়স ২১ বছরের বেশী ও যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারাই জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ, পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ডাক বাংলো সংরক্ষণ ছিল জেলা বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কাজ।

ইউনিয়ন বোর্ড যে সব সমালোচনার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত ভোটাধিকার প্রক্রিয়া, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি ও জেলা পরিষদের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা।

৩.০ পাকিস্তান আমল

৩.১ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতের স্বাধীনতার দাবী জোরদার হতে থাকে। ফলে বৃটিশরা ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি দেশে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে।

৩.২ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯

পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান অধিষ্ঠিত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯ জারী করেন। এ আদেশ বলে মূলত ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যেমন ঃ

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল

২. থানা কাউন্সিল

৩. জেলা কাউন্সিল

৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের গঠন, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। এ আদেশ বলে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. গড়ে দশ হাজার লোকবসতি সম্পন্ন এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হতেন।

২. এই সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকেই ১জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

৩. ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয় প্রথম বারের মতো।

৪. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে মোট ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর মধ্যে পৌর কার্যাবলী, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা, রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার কার্যাদি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল জাতীয় পুনর্গঠন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কার্যাদিও সম্পাদন করতো। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক ও বিবাহ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল।

৫. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠনের জন্য সম্পত্তির উপরে কর, চৌকিদারী রেট ও অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এছাড়া পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করার জন্য সরকার থেকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

৩.৩ একটি থানার আওতায় সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস এবং সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য হতেন। মহকুমা প্রশাসক বা এসডিও পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সহ-সভাপতি হতেন। থানা-কাউন্সিল মূলত সমন্বয়কারীর ভূমিকাই পালন করতো। তার কর ধার্য করার তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না।

৩.৪ জেলা কাউন্সিল সরকারী ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলের ৫০% সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বাকী ৫০% সদস্য হতেন পদাধিকার বলে জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকতেন। তবে ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত (বেসরকারী) প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়। সড়ক, ভবনাদি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ, ডাক-বাংলোর সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদসমূহের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

৩.৫ কোন বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার পরিধির মধ্যে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো। বিভাগীয় কাউন্সিলের ৫০% সদস্য বিভিন্ন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ হতেন। আর বাকী ৫০% সদস্য বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্থানীয় পরিষদসমূহ এবং মিউনিসিপ্যাল সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ছিল বিভাগীয় পরিষদ এর মূল কাজ।

৩.৬ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে স্থানীয় আইনের আওতায় স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ/ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আরো বেশী মাত্রায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা হয় তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। তবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান পদে সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত হওয়ায় স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের দূর্নীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব তথা সদস্যগণ প্রেসিডেন্টকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিতকরণের জন্য ইলেকটোরাল কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সরকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করা; আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বা ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব থাকায় এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের সাফল্য ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। মৌলিক গণতন্ত্র ধনী জোতদার, মহাজন ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় (সোবহান ১৯৭৮)। তা স্বত্বেও এলিয়ট টেপার (১৯৭৬) মনে করেন কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এই মৌলিক গণতন্ত্র।

৪.০ বাংলাদেশ আমল

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা আনয়নের জন্য কিছু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ায় এবং এদেশের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/পার্লামেন্ট না থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭ (পি, ও, নং-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সবকয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের তৃণমূল প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।

৪.২ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২-১৯৭৩

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে ৩ জন

করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

৪.৩ স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ -১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী হয়। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়। যদিও এই অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অনুরূপ রাখা হয় তবুও এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উল্লেখযোগ্য যে সব পরিবর্তন ঘটে তা হলো ঃ

(১) ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি রহিত করে দেয়া হয় (২) একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য সরাসরি ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি (ভোটার) গণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান (৩) দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন মনোনীত (কৃষক প্রতিনিধি) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ভুক্তির বিধান (৪) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর করা হয় (৫) এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদকে মোট ৪০টি কাজের ভার দেয়া হয়। সমস্ত কার্যাবলীকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমনঃ (১) পৌর কার্যাবলী (২) রাজস্ব প্রশাসন কার্যাবলী (৩) নিরাপত্তা কার্যাবলী (৪) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

তাছাড়া ১৯৭৬ সালের জারীকৃত ভিলেজ কোর্ট অর্ডিন্যান্স বলে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া জাতীয়তা প্রত্যয়নপত্র, চরিত্রগত প্রত্যয়ন পত্র, আয় প্রত্যয়ন পত্র প্রদান এবং আদম শুমারীর কাজে সহায়তা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ ছিল।

এ অধ্যাদেশের বলে থানা পরিষদ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা, মহকুমা প্রশাসককে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কে থানা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্তির বিধান রাখা হয়। থানা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করতো ঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির কর্মকান্ডে সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;

২. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. থানা পরিষদ এলাকায় সমুদয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন।

এই আদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যদের মোট সংখ্যক

সদস্যের কমপক্ষে এক দশমাংশ মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দেয়ার নিয়ম ছিল। নির্বাচিত এবং মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, ডাকবাংলো ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা। তাছাড়া স্বেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী জেলা পরিষদ সম্পাদন করতে পারতো।

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও থানা উন্নয়ন কমিটি নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। যাতে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সদস্য হিসাবে থাকতেন। থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও একজনকে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নের সাধারণ দায়িত্ব এ কমিটি পালন করে থাকে।

৪.৪ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রবর্তন করা হয়। একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ মোট এগারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়। গ্রাম প্রধান এ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সচিব নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কার্য পরিধি ছিলো নিম্নরূপ :

১। খাদ্য উৎপাদন

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণ

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

৪। আইন শৃঙ্খলা

কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। ১৯৮২ সালে এ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষিত হয়।

৫.০ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ- ১৯৮২

৫.১ ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে কার্যকর এই অধ্যাদেশ বলে প্রথমে উন্নত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়।

থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত ক) সংরক্ষিত ও খ) হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ-এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয় অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় ভিত্তিক কর্মসূচী সম্প্রসারণ, পশুপালন ও মৎস চাষ এরূপ দশটি বিষয় হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন কার্য, এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন সহ তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। উপজেলা আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় বিশজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোষ্টিং দেয়া হয়েছিল। সকল কর্মকতা উপজেলা পরিষদে থাকতেন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হঁতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি উপজেলা পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতেন, কর ইত্যাদি আরোপ করা সহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়।

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মুনসেফ উপজেলায় বদলী করে তাদের উপজেলাধীন ফৌজদারী এবং দেওয়ানী বিচার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। তবে এই অধ্যাদেশটি ১৯৯১ সালে বাতিল (রিপিল) করা হয়।

৬.০ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অধ্যাদেশটি জারী করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য তিনজন করে মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১ জন মহিলা সদস্য মনোনীত করা হয়-যারা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবে। ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট সরকার এক সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৯৮৯ সালের ৯ই এপ্রিল পুনরায় এক সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দেবে। ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি থেকে কমিয়ে ৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো ঃ ১। বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর ২। গ্রাম্য পুলিশ রেট ৩। জন্ম, বিবাহ ও ভোজ্যের উপর ফি ৪। জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত

জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণ কাজে ফি। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

৭.০ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন-১৯৮৮

৭.১ ১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনটি বলবৎ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে বলে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশ হবার আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বতন ২২টি জেলায় জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। এই আইন প্রণীত হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়। জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার ও অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যানগণকে পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য করার বিধান এ আইনে রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ছিলনা।

৭.২ এই আইনের প্রথম তফসীলের বিধান মোতাবেক জেলা পরিষদের দুই ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়; যেমন ঃ ১। আবশ্যিক ও ২। ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যাবলীর ১২টি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যেমন জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগ এর পুনরীক্ষণ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা-উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহ বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই রকমের জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, ডাকবাংলো, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে-শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকাবাসীদের ধর্মীয় নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে জেলা পরিষদ তার তহবিলের সংগতির উপরে ভিত্তি করে সরকারী নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আর ইচ্ছে

করলে বা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। তাছাড়া সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারে। তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপরে দায়যুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৭.৩ দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণনানুযায়ী জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ৮টি উৎস থেকে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে: (১) স্থাবর সম্পত্তির উপরে ধার্য করের অংশ, (২) বিজ্ঞাপনের উপরে কর (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পূল ও ফেরীর উপরে টোল (৪) জেলা পরিষদ স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস, (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেট (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমুলক কাজ থেকে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আরোপিত কোন কর।

৭.৪ এই আইন বলে জেলা পরিষদের একজন করে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান (যিনি সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য) নিয়োগদানের বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে একবার চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি সংশোধনী আদেশ জারী করে চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে। আর সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যৈষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে মোট ৬১টি জেলায় প্রবর্তিত হয়।

৮.০ রাংগামাটি/বান্দরবন/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন -১৯৮৯

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬১টি জেলা পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এ তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাক্রমে রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৮ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ পৃথক তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

৯.০ পল্লী পরিষদ আইন-১৯৮৯

পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে আইনটি পাশ হয়েছিল। কিন্তু এই আইনটি যেহেতু অনেকটা রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল তাই তৎকালীন সরকার পতনের ফলে বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

১০.০ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন-১৯৯৩

১৯৯৩ সালের ২২শে জুলাই এ আইনটি প্রণীত হয়। যা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে। এই আইন বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং তিনটি ওয়ার্ডের নয়জন (প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন) নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করার বিধান কার্যকর হয়। এই আইন বলে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পষিদ) অধ্যাদেশের ১৮ ধারার পরিবর্তন করে বলা হয় যে, ইউনিয়ন পষিদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়া) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে। এ আইন বলে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ শব্দের পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ, যেটা প্রযোজ্য হয়-এ শব্দ ও কমাগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ৫১নং ধারা এবং প্রথম তফসীলের সংশোধন আনয়ন করে উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ শব্দগুলির পরিবর্তে জেলা প্রশাসক শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে ৬টি খাতকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখকরণঃ

১। বসতবাড়ীর ইউনিয়ন কর আদায় ২। ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফেরীওয়ালাদের উপরে কর ধার্য্যকরণ ৩। সিনেমা নাটক, থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির উপর কর ধার্যকরণ ৪। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি ৫। ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট হাট-বাজার এবং ফেরীর উপরে কর ধার্যকরণ (উল্লেখযোগ্য যে, হাট-বাজার ও ফেরীঘাট এর উপর কর, ইজারা প্রদত্ত অর্থ ধার্যের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে) ৬। ইউনিয়ন সীমারেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থিত জলমহলগুলির (যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত) উপরে কর (ইজারা প্রদত্ত অর্থ)।

১১.০ এ আলোচনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক অর্থাৎ পৌর-সভার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। অথচ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের সুচনালগ্নে সর্ব প্রথম পৌরসভার বিকাশ ঘটানো হয়। ১৮৫৬ সালে এ উপমহাদেশের প্রথম পৌরসভা নাসিরাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। পৌরসভা ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়।

১৯৩২ সালে দি বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৯৬০ সালে দি মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৭৭ সালে দি পৌরসভা অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালে দি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স

প্রণীত হয়। ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স এবং খুলনা মিউনিসিপ্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ সালে প্রণীত হয়।

পৌরসভাগুলি সাধারণত ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে গঠিত হয়। তাছাড়া ৩ জন করে মহিলা সদস্য থাকেন প্রতিটি পৌরসভায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২৬টি পৌরসভা আছে। তার মধ্যে প্রায় ৫০টি পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদের মতো, ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। বাদবাকী পৌরসভাতে জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ড কমিশনারের সংখ্যার তারতম্য ঘটে ওয়ার্ডের সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী।

১১.২ পৌরসভা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাজের মধ্যে আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, নর্দমা নির্মাণ, নগর উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ ও উদ্যান সংরক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন, ইত্যাদি। আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের জন্য বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এসব সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসেবে একজন মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

১১.৩ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হলো গৃহ এবং জমির উপরে কর ও সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর, যানবাহন কর, পেশা ও বৃত্তির উপরে কর ইত্যাদি। তাছাড়া পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার বাতির ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি সার্ভিসের জন্য জনসাধারণের উপরে রেট ধার্য পৌর কর্তৃপক্ষ করে থাকে।

১২.০ উপসংহার

অতীতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারগুলির অন্যতম দায়িত্ব ছিল গ্রাম পর্যন্ত সরকারী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বা সরকারী শাসনাদর্শ গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন বর্তমানে স্থানীয় সরকারসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে সাথে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসলেও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা অথবা সম্পদ না থাকার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীলতা, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারের অনীহা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার

প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেনি।

তবে আশার কথা, বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার শক্তিশালী ও কার্যকর সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিচ্ছে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদগুলো যাতে কার্যকর ও সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারে সেজন্য ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধনী) আইন ১৯৯৩ জারী করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের, যিনি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮২।

২। ভূইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, *লোক প্রশাসনের রূপরেখা*, ঢাকা বুক হাউজ, ১৯৭৯।

৩। হক, আবুল ফজল , *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

4. Ali AMM. Showkat. *Field Administration & Rural Development in Bangladesh*, Dhaka. CSS-1982.

5. Ali Shaikh Maqsood etal. *Decentralization and People's Participation in Bangladesh*, Dhaka. NIPA. 198.

6. Dacca University. Department of Political Science. *Politicies and Administration in Bangladesh*, Dhaka. 1980.

7. Khan. Md. Mohabbat and Zaforullah. Md. Habib (ed) *Rural Development in Bangladesh : Trends and Issues*, Dacca. Centa. 1981.

8. Rahman. Atiur. *Rural Power Structure : A Study of the Local Level Leader in Bangladesh*, Dhaka. BBI. 1981.

9. Alam. Manjur-ul. *Local Government at work in Rural Bangladesh.* Journal of BARD. Vol-VI. No.2. 1977. PP. 17-25.

10. Islam. Shamsul. *Local Government and National Development Quarterly*, Vol-6c No-3. 1977.

11. Molla. Md. Giasuddin. *New Hopes for Union Parishads : Case of Bangladesh*, Administrative Science Review. Vol-VIII. No-1. 1978. PR 43-47.

12. Rahman M. Lutfur and Das. Nr. *Union parshad Taxes : Nature of payemnt by the farmers.* Administrative Science Review. Nol-X. No. 4. 1980 PP. 17-28.

১৩। আজম, কে, কিউ এবং হোসাইন, আলী আজম, *ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা-চেয়ারম্যানবৃন্দ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন* Local Government Quarterly. Vol-8. No-1-4. 1979. PP. 52-57.

১৪। আলম, জগলুল *গ্রামীণ প্রশাসন ঃ কয়েকটি সমস্যা*, দৈনিক বাংলা, ২০শে জুলাই, ১৯৮২।

১৫। রহমান এ, এইচ মোঃ আমিনুর, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা*, Local Govgenrment Quarterly Vol-7, No-1-4, 1978.

16. Ahmad. J. Minhasudding, *Training Union Parishad Chairmen*, Bogra, RDA, 1980.

17. Alam Manjur-ul; *Leadership Pattern, Problemes and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh;* Comilla, BARD, 1976.

18. Tepper. E. L., (1976) *The Administration of Rural Reform : Structural Constraints and Political Dilemmas, in Stevens R. D. et* al (eds) *Rural Development in Bangladesh and Pakistan.* Honolulu the university Press of Hawaii, PP29-59.

19. Sobhan. R. (1978) *Basic Democracis, Works Programmes, and Rural Development in East Pakistan,* Dhaka : Bureau of Economic Research.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অবদান ঃ প্রাচীন কাল

আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান *

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবদান থাকলেও সুলিখিত ও সুগ্রথিত প্রমাণপঞ্জীর অভাবে বর্তমান-কালে তা পর্যালোচনা করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রাক-বৈদিক যুগ সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া সম্ভব হয়নি। বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ নিয়ে পর্যালোচনার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদান সম্পর্কে বিস্তর অগ্রথিত তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু দুটি মূল কারণে এই তথ্য প্রমাণাদি সম্পূর্ণ আকারে পেশ করা সম্ভব হয়না। প্রথমত, ভারতের প্রাচ্য অঞ্চল তথা বাংলাদেশের সেকালে নিজস্ব কোন ভাষালিপি ছিলনা। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবদান থাকলেও তা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, বেশীর ভাগ তথ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন দেশের তৎকালীন পরিব্রাজকদের গ্রন্থ থেকে। বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখায় অত্যন্ত সংগত কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও বর্ণনা বিধৃত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতামতও ব্যক্ত হয়েছে। সে সমস্ত মতামত ও তথ্য একসূত্রে গ্রথিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক তথ্যই বর্জন করতে হয় এবং কিছুটা ভ্রান্তির অবকাশও থেকে যায়।

১.২ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর প্রাচীন কালীন অবদান বিশ্লেষণের প্রারম্ভে সে কালের বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা প্রয়োজনীয়।

২.১ বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাষা

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও বৈয়াকরণদের মতে বাঙ্গাঁলীর প্রাচীন ভাষা 'অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা' যা মন্‌খ্‌মের ভাষা পরিবার ও কোলমুন্ডা ভাষা পরিবারের ঘনিষ্ঠতর ছিল। এর সাথে যুক্ত হয় দ্রাবিড় ভাষা। এ ছাড়া 'ভোট ব্রক্ষ্ম' ও 'কিরাতজন'দের ভাষাও এই ভাষার সাথে সংমিশ্রিত হয়। উপর্যুক্ত ভাষাগুলোর সব ক'টি মূলত অনার্য ভাষা ছিল। কালক্রমে মধ্য ও উত্তর ভারত থেকে নানা-ধর্মী যতি (মুনি) সন্যাসী. বণিক. সার্থবাহ (বণিকদের পথ প্রদর্শক), সৈনিক ও রাজপুরুষের আগমনের ফলে অনার্যদের

---

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণের সাথে সাথে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। পরবর্তীকালে যদিও প্রাচ্য (বাংলাদেশ) অঞ্চলে মাগধী ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের মাঝে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাজ কার্যে সংস্কৃতই মূলভাষা রূপে বহুকাল বিদ্যমান থাকে। সংস্কৃতকে তখন কুলীন ও বিজ্ঞজনদের ভাষারূপে অভিহিত করা হতো। তৎকালীন বাঙ্গালী পন্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষাকে ভালরূপে আত্মস্থ করতে সক্ষম হননি। এর ফলেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালী পন্ডিতগণ কোন গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেননি।

২.২ ৮০০-১১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি ভাষা সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল। সেগুলো হলো-সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সর্বদা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো। পন্ডিতগণ কথোপকথনে প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করতেন-তবে তার বাচনভঙ্গী ছিল কুণ্ঠিত। প্রাকৃত ভাষায় কোন সাহিত্য গড়ে উঠেনি। তবে বৌদ্ধদের রচনায় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র-সংস্কৃত ভাষা দেখা যায়। এই ভাষাকে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' ও বলা হয়ে থাকে। শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতে কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা তাদের দোহাগুলো রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে মৈথিল কবি 'বিদ্যাপতি' এই শৌরসেনী ভাষায় 'কীর্তিলতা' কাব্য রচনা করেন। নবম শতকের পর শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশ ভাষা প্রায় পাশাপাশি ভাষারূপে বিবেচিত হতো। মাগধী অপভ্রংশ ভাষা বিবর্তিত হয়ে প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলার চর্যাগীতিগুলো এই ভাষায় রচিত হয়।

৩.০ বঙ্গ ভূমির সীমারেখা

প্রাচীন বাংলাভূমির রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা একত্রিত করে সমগ্র বাংলা রূপে চিহ্নিত করা সম্ভবপর, প্রাচীনকালে বঙ্গভূমির সেরূপ কোন সীমরেখা ছিলনা। বর্তমানের বঙ্গভূমি প্রাচীনকালে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাবলীর সমাহার ছিল। তখনকার দিনে মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ এই অঞ্চলকে 'প্রাচ্য অঞ্চল' বলে অভিহিত করতো এবং 'অস্পৃশ্য জাতির বসবাস এলাকা' বলে বিশ্বাস করতো। তাদের ঘৃণাবোধ এতদুর বিস্তৃত ছিল যে, কেউ এদেশ ভ্রমণ করে উত্তর বা মধ্য ভারতে ফিরে গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। বঙ্গভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সীমানা কখনও নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন রাজশক্তির জয় পরাজয়ে রাজ্যের সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী মানুষের কথ্য-ভাষার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল, তবে তাদের সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে মোটামুটি একটা সাযুজ্য বিরাজমান ছিল।

৪.০ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্জীর উৎস

৪.১ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলার মানুষদের কোন ভাষা লিপি ছিলনা এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমী শতকের পূর্ব পর্যন্ত তারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনায় সক্ষম

হয়নি। তবে খৃষ্টপূর্ব আমলে এবং ষষ্ঠ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে বঙ্গদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল; এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাকৃত, মাগৃধী, পালি প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন এলাকায় টোল, বিহার, আশ্রম নামক বিদ্যাপিঠগুলোতে শিক্ষাদান প্রথা চালু ছিল।

৪.২ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীসের দার্শনিক ও ভূগোলবিদ টলেমী এদেশ পরিভ্রমণে আসেন এবং গঙ্গার পূর্ব তীরের অধিবাসীদের (তৎকালীন মুরন্ড জাতি) সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তাঁর 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে পরিবেশন করেন। পঞ্চম ও সপ্তম শতকে ফাহিয়েন ও হিউ এন সাঙ নামক চীনা পরিব্রাজক বঙ্গদেশে শিক্ষালাভ ও পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তাঁদের গ্রন্থাবলী থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাবলী পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া গেছে তিব্বত ও নেপাল রাজ দরবার থেকে। তিব্বতের 'তিব্বতী গ্রন্থ তালিকা', লামা তারনাথ রচিত 'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস', সুম্পা রচিত 'পাগ-সাম্-জোন-জাং' এবং 'লামা বুতান' রচিত 'ত্যাংগুর' গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অবদানের বহু তথ্য পাওয়া গেছে। নেপালের রাজ দরবার থেকে 'চর্যাগীতি' নামক যে কাব্য সংকলনটি পাওয়া গেছে, তা তৎকালীন বাঙ্গালীর আদি বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়।

৪.৩ এছাড়া তা-চেং-টেং নামক একজন চীনা ছাত্র তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারে ১২ বছর শিক্ষা লাভ করে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। 'নাগার্জুন বোধিসত্ত সুহৃল্লেখ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। মুলত উপর্যুক্ত তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী থেকেই প্রাচীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-চর্চা ও অবদান আলোচিত হয়ে থাকে।

৫.০ প্রাচীন তথ্যপঞ্জী বিশ্লেষণের সমস্যা

৫.১ প্রাচীন তথ্যপঞ্জীর বেশীর ভাগ যেহেতু তিব্বতী ভাষায় রচিত, তাই সে আমলের বাংলাদেশের স্থান ও লেখকের নাম সনাক্ত করা যথেষ্ট কষ্টকর বিবেচিত হয়। যেমন, প্রাচীন গ্রন্থকারদের ঠিকানায় 'জাহোর' ও 'সাহোর' নগরের নাম দুটি উল্লিখিত রয়েছে। এ দুটি ঠিকানাকে কোন কোন ঐতিহাসিক একটি ঠিকানা বলে প্রমাণ করেছেন এবং স্থান হিসেবে 'যশোহর' এলাকাকে নির্ধারণ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক সাহোর বলতে বর্তমান ঢাকা জেলার সাভার এলাকাকে সনাক্ত করেন। অনেকে আবার জাহোর/সাহোর বলতে পাকিস্তানের 'লাহোর' এলাকাকে নির্দিষ্ট করেন। ঠিক এমনিভাবে 'উড্ডিয়ানা' নামক স্থানটিকে সনাক্ত করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কেউ একে উড়িষ্যা এলাকা, কেউ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এলাকা এবং কেউ পুন্ড্রবর্ধনের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য (বাংলাদেশের) বলে সনাক্ত করেন।

৫.২ অন্যদিকে প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রবিদ 'নাগবোধি'কে কেউ উত্তর প্রদেশের লোক মনে করেন, আবার অন্যরা তাকে বাঙ্গালী বলে দাবী করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার

'শান্তরক্ষিত' কে কেউ কেউ মধ্য ভারতের অধিবাসী মনে করেন। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক তাকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করেছেন।

৫.৩ তথ্যপঞ্জীর বিশ্লেষণে এরূপ সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও অন্যান্য অবস্থার সাথে সংগতি রেখে বাঙ্গালীর নাম ও স্থানের নামের সনাক্তিকরণ করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের মতামতকে এই আলোচনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৬.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সম্প্রদায়গত অবদান

৬.১ প্রাচীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান বিশ্লেষণে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথেষ্ট কীর্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে প্রাচ্য অঞ্চলীয় তথা বঙ্গভূমির হিন্দুগণ অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ছিল বলে সংস্কৃত ভাষা অধিকার ও প্রয়োগ ক্ষমতা তাদের বিশেষ একটা ছিলনা। উত্তর ও মধ্য ভারতীয় কুলীন হিন্দুগণ সর্বদায় এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো এবং বিদ্যা চর্চার অধিকার সীমিত রাখার প্রচেষ্টা চালাতো। ধর্মীয় গুরু হিসেবে বিবেচিত খুবই কম সংখ্যক জনগণের একটা শ্রেণী বিদ্যাচর্চায় রত ছিল।

৬.২ বৌদ্ধ আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি বৌদ্ধ রাজাগণ বিদ্যাচর্চায় ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করে। বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত মহাবিহারগুলোতে বিদ্যাচর্চার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। তৎকালীন বৌদ্ধ মহাবিহারগুলোর প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে বাংলার পাল রাজাগণ সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছে। বিখ্যাত মহাবিহারগুলোর মধ্যে নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল বাদে বাকী সবগুলোই বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল। উল্লেখযোগ্য বিহারগুলোর নাম হচ্ছে ঃ জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পন্ডিত, পট্টিকেরক, প্রভৃতি।

৬.৩ মধ্যযুগের পূর্বে যেহেতু মুসলিমগণ এদেশে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেনি এবং এই ধর্মানুসারীদের অবস্থিতি ছিল না, তাই প্রাচীন কালীন বর্ণনায় তাদের আমল সম্পর্কে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়।

৭.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদান

৭.১ প্রাচীনকাল হিন্দু তথা ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মগুরুদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান ছিল, তবে বৌদ্ধদের আমলে 'বিহার' সৃষ্টি পদ্ধতিতে তারাই সর্ব প্রথম বঙ্গদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সংগঠিত ও সবার জন্য উন্মুক্তভাবে আরম্ভ করে। হিউ-এন-সাঙ প্রমাণ করেন যে, বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রই পঠিত হতোনা, বরঞ্চ ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত, চিত্রকলা, মহাযান-শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগ-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ও অধিতব্য ছিল। প্রতিটি বিষয়ের পন্ডিত ও গ্রন্থ সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

৭.২ ব্যাকরণ শাস্ত্র ঃ চন্দ্রগোমী নামক একজন পন্ডিতের 'চান্দ্র ব্যাকরণ' গ্রন্থ তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে এর প্রভূত প্রচলন হয়। তবে তত্ত্ব ও রীতির অভাবে এই ব্যাকরণ স্থায়িত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগোমীর জন্মস্থান ছিল বরেন্দ্রীতে এবং পরে তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হয়ে চন্দ্রদ্বীপে আবাস নির্মাণ করেন। তিনি সপ্তম শতকে বা তারও আগে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি তর্কবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন এবং 'ন্যায় সিদ্ধালোক' নামে তর্ক শাস্ত্র সৃষ্টি করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের 'বজ্রযান' বিষয়ক ৩৬ টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

৭.৩ দর্শন ঃ সপ্তম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে 'গৌড়পাদ কারিকা' নামে ২১৫টি শ্লোক বিশিষ্ট একটি দর্শন শাস্ত্র জনৈক 'গৌড়পাদ' কর্তৃক প্রণীত হয় যিনি গৌড় রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। মুসলিম পরিব্রাজক আল-বিরুনী জনৈক গৌড় সন্যাসীর একটি 'সাংখ্য কারিকা'র কথা উল্লেখ করেছেন, অনেক ঐতিহাসিক ঐ সন্যাসী হিসেবে গৌড়পাদকেই সনাক্ত করেছেন। এই দর্শন ছিল প্রাক-শংকর বৈদান্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সুক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও সাংগীকরণ।

শ্রীধর ভট্ট নামক অপর একজন লেখক 'ন্যায় কন্দলী' নামে একটি দর্শন ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচনা করেন-যা সর্ব ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে। ৯১৩ সালে এটি রচিত হয়। তার অন্যান্য আরও গ্রন্থ ছিল-যা কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে।

৭.৪ হস্তী আয়ুর্বেদ বিদ্যা ঃ প্রাচীনকালে বাংলাদেশে প্রচুর বন-জংগল থাকায় হাতীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। রাজা ও শাসকগণ যানবাহন হিসেবে ও যুদ্ধ বিগ্রহে হাতী ব্যবহার করতেন। অনেক সময় হাতী মালামাল পরিবহনে বাণিজ্যিক বাহন হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। হাতীর চিকিৎসার্থে সে আমলে 'হস্তায়ূর্বেদ' বা 'গজ চিকিৎসা গ্রন্থ' রচিত হয়। জনৈক 'পালকাপ্প' নামক হস্তী চিকিৎসকের কথোপকথন থেকে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল (চম্পার রাজা রোমপাদের সাথে পালকাপ্পের কথোপথন)। অনেকে অবশ্য উপর্যুক্ত মতামত অস্বীকার করেন এবং গ্রন্থটি পালকাপ্পের কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেননা, দ্রাবিড় ভাষায় পাল ও কপি-দুটোর অর্থই হাতী। তবে গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং সেটি একাদশ শতকের পূর্বে রচিত তার প্রমাণও রয়েছে। অন্যান্য প্রমাণাদি থেকে বলা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই হস্তী চিকিৎসার একটা ঐতিহ্য বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল এবং কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

৭.৫ যোগশাস্ত্র ঃ গৌড় নিবাসী অভিনন্দ 'যোগ্যব্যশিষ্ঠ সংক্ষেপ' নামে একটি যোগ শাস্ত্র রচনা করেন। গ্রন্থটি ৬ প্রকরণ ও ৪৬ সর্গে বিভক্ত। তিনি ন্যায় শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন।

৭.৬ চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ চক্রপাণি দত্ত নামক সর্ব ভারতীয় রোগ নিদানবিদ ছিলেন গৌড় রাজ্যের কর্মচারী নারায়নের পুত্র। চক্রপাণির এক ভাই ভানু ছিলেন রোগ নিদান

শাস্ত্রে সুপন্ডিত ও সুচিকিৎসক। চক্রপাণি রচিত 'আয়ুর্বেদ দিপীকা, শব্দ চন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' গ্রন্থ ত্রয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থটি ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৭.৭ **জ্যোতিষ শাস্ত্র ঃ** জনৈক কল্যাণ বর্মা নামক বাঙ্গালীর রচিত ''সারাবলী' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ। মুসলিম পরিব্রাজক আল-বিরুনী এই গ্রন্থের বহু বচন ও শ্লোক উদ্ধার এবং প্রকাশ করেছিলেন।

৭.৮ **রসায়ন শাস্ত্রঃ** রসায়নাচার্য নাগার্জুনের প্রধান সহায়ক ছিলেন 'নাগবোধি'। নাগবোধিকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করেছেন। নাগার্জুন যখন পুন্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণা করতেন, তখন নাগবোধি প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে নাগবোধি ১৩ খানা রসায়ন শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

৭.৯ **ধর্ম শাস্ত্র ঃ** একাদশ শতকে জিতেন্দ্রীয় ও বালক নামক ব্যক্তিদ্বয় ধর্মশাস্ত্র রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের কোন রচনা বর্তমানকালে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের রচনাগুলো পরবর্তীকালে জীমুতবাহন, শুল পাণি, রঘুনন্দন, প্রমুখ বাঙ্গালী পন্ডিতগণ পর্যালোচনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, একাদশ শতকে গ্রন্থকারদ্বয়ের রচনা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এছাড়া বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিস্তর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উক্ত ধর্ম প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ প্রণেতাই ছিলেন বাঙ্গালী। এঁদের রচিত মহাযান, বজ্রযান, কালচক্র যান, সহজযান, নাথ ধর্ম, কোল ধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলি সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৭.১০ **সাহিত্য (কাব্যচর্চা) ঃ** সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলাদেশে সাহিত্য চর্চায় দু'প্রকারের রীতির বিদ্যমানতা দেখা যায়। রীতি দুটির নাম ছিল বৈদভী ও গৌড়ী। বৈদভী রীতিতে 'দন্ডী' নামক কবি প্রধানত কাব্য চর্চা করেছেন। গৌড়ী রীতিতে কাব্য চর্চা করেন ' ভামহ' নামক কবি। কালক্রমে দশম ও একাদশ শতকে গৌড়ী রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গৌড়ী রীতি তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

গৌড়ীয় জনগণ গৌড়ী রীতিতে কাব্য চর্চাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ ও পালনে সচেষ্ট হয় এবং মধ্য ভারতীয় রাষ্ট্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। রাজা শশাংকের আমলে এসে গৌড় রাষ্ট্র-চেতনা পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী রাজাগণ গৌড়সহ অন্যান্য রাজ্যের অধিপতি হয়েও নিজেদেরকে 'গৌড়াধিপতি' বলে পরিচয় দিতেন।

৭.১১ **কাব্য সংকলন ঃ** নেপালে একাদশ-দ্বাদশ শতকে রচিত একটি কাব্য সংকলন পাওয়া গেছে, যার নাম 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'। এতে সংকলয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটিতে ১১১জন কবির মোট ৫২৫টি শ্লোক আছে। তারমধ্যে

কালীদাস, অমরু, ভবভুতি, রাজশেখর প্রমুখ কতিপয় অবাঙ্গালী কবির কবিতাও রয়েছে।

বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে অভিনন্দ, ডিম্বক, কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকর গুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, ললিতক, বিণয়দেব, ছিত্তপ, বন্দ, তথাগত, জয়ীক, শুভংকর, শ্রীধর নন্দী, রতিপাল, সোনোক, অপরাজিত, রক্ষিত, প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় এ ধরনের কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন বাংলাদেশেই প্রথম সৃষ্টি করা হয়। এর পরের কাব্য সংকলন পর্বের নাম 'সদুক্তি কর্ণামৃত'। এর সংকলয়িতা কে তা স্পস্টভাবে জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদগণ সংকলয়িতাকে একজন বাঙ্গালী হিসেবে ধারণা করেন।

নবম-দশম শতকে প্রণীত আরেকটি কাব্য গ্রন্ত বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষভাবে গর্বের বস্তু, যার নাম 'চর্যাগীতি'। এটি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত। এই ভাষাকে অনেক ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণ 'আলো আঁধারী ভাষা' বলে উল্লেখ করেন। মাগ্ধী অপভ্রংশ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রবেশের সন্ধিক্ষণে উক্ত গ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত। এর অনেক শব্দ বর্তমান বাংলা ভাষায় বিদ্যমান নেই। কাব্য গ্রন্থটি নেপালের রাজ দরবার থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চর্যাগীতির লেখকগণের অধিকাংশই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিদের নাম শান্তিপাদ, সরোরহ বজ্র, কুক্কুরী পাদ, শবরী পাদ। কুক্কুরী পাদের দুটি কবিতা (চর্যাগীতি ও চর্যা বিনিশ্চয়) এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সে আমলের অন্যান্য অনেক কবির কবিতা চর্যাগীতিতে সংকলিত হয়েছে।

৮.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে প্রাচীন বাঙ্গালী মনীষী

৮.১ মহাচার্য শীল ভদ্র ঃ নালন্দা মহা বিহারের মহাচার্য শীল ভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাক্ষ্রণ্য রাজ বংশের সন্তান এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং এর গুরু। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারে দেশ বিদেশের ১০ হাজার ছাত্র (শ্রমন) শিক্ষা লাভ করতো। তিনি সে আমলের সকল শাস্ত্রের সুপন্ডিত ছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের সকলে তাকে 'সদ্ধর্মের ভান্ডার' বলে সম্ভাষণ করতো।

৮.২ শান্ত রক্ষিত ঃ শান্ত রক্ষিত ছিলেন সাহোর (?) রাজবংশের সন্তান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের তিন বা সাতখানা তান্ত্রিক গ্রন্থ্ রচনা করেন। তিব্বতের তৎকালীন রাজা 'খ্রিসংলদেব্যসান' এর আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যান। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যর্থ হয়ে নেপাল ফিরে আসেন। পরে আবার আমন্ত্রিত হয়ে সাথী 'পদ্ম সমভব'কে নিয়ে তিব্বত গমন করেন এবং তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। রাজা খুশী হয়ে 'বসময়া' নামক একটি বিহার তিব্বতে প্রতিষ্ঠা করে শান্তরক্ষিতকে তার প্রথম সংঘাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেন। শান্তরক্ষিত বাকী জীবন সেই বিহার পরিচালনা করেছিলেন।

৮.৩ দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ঃ একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পন্ডিত অতীশ দীপংকর বাংলাদেশের বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্র যোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন বলে বিক্রমশীল মহাবিহারের

মহাচার্য পদে রাজা মহীপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ ১৩ বছর তিনি তিব্বতে ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি ওদন্তপূরী বিহারেরও আচার্য ছিলেন। ত্যাংগুর গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জীবনে ১৭৫ খানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছিলেন। বাংলাদেশ ও তিব্বতের মাঝে সেতু বন্ধন রচনায়, চরিত্রে, পান্ডিত্যে, মনীষায় ও আধ্যাত্ম গরীমায় তিনি সে কালের ভারতবর্ষের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিক্রমশীল মহাবিহারের অধিনায়ক রত্মাকর বলেছিলেন, "দীপংকর ছাড়া ভারতবর্ষ অন্ধকার।" সে আমলে কোন বাঙ্গালী ভারতবর্ষে তাঁর মত প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হননি।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত তৎকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ পন্ডিত, লেখক ও অনুবাদকদের মধ্যে বিশিষ্ট বাঙ্গালী ছিলেন জ্ঞানশীমিত্র, অভয়াকরগুপ্ত, দিবাকর চন্দ্র, রত্মাকর শান্তি, কুমার ব্রজ, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞা বর্মা, প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ।

৯.০ উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন আমলে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন সগৌরবে বিদ্যমান ছিল, তেমনি বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। যদিও সংরক্ষণের অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ কালের স্রোতে অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তথাপি যা আছে বা প্রমাণিত হয়েছে, তা একটি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আজাদ, হুমায়ন *'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান'* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

২। আশরাফ, কে, এম, *'Life and Condition of the people of Hindustan.*

৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, *"The Origin and Development of the Bengali Language.'* কোলকাতা।

৪। ভাদুরী, জে, সি *'বাংলার সামাজিক ইতিহাস'* কোলকাতা

৫। মজুমদার, আর, সি *'বাংলাদেশের ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩৫২বাং

৬। রায়, নীহার রঞ্জন, *'বাংগালীর ইতিহাস আদিপর্ব (২য় খন্ড)'* কোলকাতা।

৭। রায়, এন *'বাঙ্গালীর ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩৫৯বাং

৮। ডঃ রহিম, এম, এ *'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' (১ম খন্ড)* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনুদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৯। সেন, সুকুমার, *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)'* কোলকাতা।

১০। সেন, কে, পি, *'বাংলার ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩০৮ বাং

১১। ষ্টুয়ার্ট, সি *History of Bengal'* দিল্লী, ১৯৫৯ লন্ডন, ১৯১৩

১২। হালদার, গোপাল, *সংস্কৃতির রূপান্তর,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪

১৩। হালদার, গোপাল 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (আদি ও মধ্যযুগ) মুক্তধারা, ঢাকা,১৯৭৬

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, আধুনিক প্রযুক্তি ও মূল্যবোধ ঃ প্রসঙ্গ-বাংলাদেশ

ডঃ শেখ আবদুস সালাম *
আবু জাফর মোঃ শফিউল আলম * *

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় ১২কোটি। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান নবম ও এশিয়ায় পঞ্চম। জনসংখ্যাবিদদের প্রক্ষেপণ অনুসারে আগামী ৩৪ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।[১] তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, তবে সরকারিভাবে বহুমুখী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু হওয়ায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১ ভাগ, বর্তমানে তা কমে ১.৮-এ দাঁড়িয়েছে।

১.২ ১৯৭৫ সালে এ দেশে দম্পতিদের সন্তান কামনার হার ছিল ৪,১ ভাগ; ১৯৮৯ সালে এ হার ছিল ২.৯ এবং বর্তমানে তা আরও কম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ নির্ভরশীল অর্থাৎ এদের বয়স ১৫ বছরের নীচে এবং ৬০এর উপরে। এ দেশে প্রজননক্ষম মহিলার হার মোট মহিলার ৪১ ভাগ। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৮ জন নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতা, বাকী ৫২ ভাগ সক্ষম দম্পতিও কোন না কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত, এটি অবশ্য একটি আশাব্যঞ্জক দিক।[২]

১.৩ বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৩ সালে এবং তা ছিল বেসরকারি উদ্যোগে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৭৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির জন্য একটি নীতিমালা প্রণীত হয়। বর্তমানে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচির জন্য একটি নীতিমালা

* সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয

* * ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট

প্রণীত হয়। বর্তমানে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এখন একটি আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত।

২.০ জনমিতিক স্তর ও বাংলাদেশের অবস্থান

২.১ E. M. Rogers[৩] জনসংখ্যা অতিক্রমণের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। রজার্স প্রদত্ত তিন স্তরের প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার। এ স্তরের সমাজ থাকে সনাতন, কৃষি নির্ভর এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আবদ্ধ। এখানে বিশেষ করে পুত্র সন্তানকে উৎপাদনের উপায় এবং লাভজনক বিষয় হিসেবে দেখা হয়। ফলে জন্মহার থাকে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায়। আবার অনুন্নত অর্থনীতি এবং চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় মৃত্যুহারও থাকে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। একই হারে জন্ম ও মৃত্যুহারের উঁচু মাত্রার কারণে জনসংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-নিম্ন মৃত্যুহার ও উঁচু জন্মহার। এ স্তরে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। এর কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অনেক শিশু হত্যাকারী ও ঘাতক রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু জন্মহার সে অনুপাতে কমেনা। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৬/৭ জন সন্তান থাকে। জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কারণে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় স্তরে গিয়ে জন্ম এবং মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়, মানুষ ক্রমশ উন্নত সমাজ এবং উচ্চতর জীবন মান অর্জন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত এদিক থেকে দ্বিতীয় স্তর পার হয়ে শেষ স্তরের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে।

২.২ অন্যদিকে জোফ (Zopf)[৪] প্রদত্ত জনসংখ্যা অতিক্রমণের ৭টি ধাপকে বিবেচনায় নিলে ৯০-এর দশকে এসে বাংলাদেশকে চতুর্থ ধাপ (Incipient Decline) এ ফেলা যায়। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-নীচু জন্মহার ও নীচু মৃত্যুহার। এ স্তরে মৃত্যুহার কমে গিয়ে স্থিতিশীল পর্যায়ে চলে আসে এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত হওয়ায় জন্মহার কমতে থাকে। জোফ নিজে অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থানকে ২য় স্তরে (Incipient Growth) দেখিয়েছেন। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-উঁচু জন্মহার কিন্তু উঁচু মৃত্যুহারের সামান্য হ্রাস। এ ধাপে শিল্পায়ন, নগরায়নের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। ফলে মৃত্যুহার সামান্য হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার আগের পর্যায়েই থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা হয় এ স্তরেই।

২.৩ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সংক্রান্ত তিন যুগের ধারণাটি বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ সেদিক থেকে সম্ভবত মাঠ যুগ পেরিয়ে সাম্প্রতিক যুগে প্রবেশ করেছে। মাঠ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে; মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'চেইঞ্জ এজেন্ট এইড' (Change Agent Aid) -এর আবির্ভাব, গণমাধ্যম প্রচারণার উপর

গুরুত্ব দেয়া, পোষ্ট পার্টাম এ্যাপ্রোচ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রসার ঘটানো। এ যুগে চেইঞ্জ এজেন্ট এইডরাই মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে। সাম্প্রতিক যুগে এর সাথে যোগ হয় আরও কিছু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়-বর্ধন প্রভৃতি সামাজিক কর্মসূচি। এক কথায় এদের বলা হয় পরিবার পরিকল্পনা বহিঃসীমা কর্মসূচি।

২.৪ সামাজিক দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজ সনাতন সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এখনও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীন নয়। কারণ সে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামর্থগত দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই সন্তান নেবে কি নেবে না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সীমিত। এ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তার স্বামী ও শাশুড়ি দ্বারা। তাই সমাজে এখনও বড় পরিবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রচারণাও রয়েছে প্রচুর। তবে ডঃ বক-ই-খুদা ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের একটি গবেষণার মত প্রকাশ করেছেন যে, এখন পরিবার পরিকল্পনার প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের মনোভাবে অনুকূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৫] কিন্তু এ কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। সাধারণ মানুষের মনোভাবেও অনুকূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এ মনোভাব অবশ্য সকল এলাকায় এবং টার্গেট জনগোষ্ঠীর সকল শ্রেণীর মধ্যে এক নয়। তাঁদের মতে এ মনোভাব আরও অনুকূল করার জন্য বিবাহ বিলম্বিত করা, ছোট পরিবার গঠন ও দুই সন্তান জন্মের মাঝের সময় বৃদ্ধি করা, প্রভৃতি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য আই, ই, সি, বার্তাগুলোতে অধিক জোর দেয়া দরকার; প্রয়োজনে এদেশের আই. ই. সি. কর্মসূচিকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক।

৩.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য

৩.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে এলেও এখনও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বহু কারণ রয়ে গেছে যা আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বড় পরিবার ধারণা, পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনাব এম. এ. মান্নান তাঁর[৬] এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের পিছনে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর রয়েছে। তাঁর মতে শৈশবে মেয়ে শিশুরা পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হলেও (কারণ তারা গৃহস্থালীর কাজ করে) ছেলেরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের জন্য অধিক কার্যকর বা উৎপাদনশীল বলে গণ্য হয়। আর মেয়েরা যে কাজ করে তা অস্পষ্ট বা এ কাজ সরাসরি কোন অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। তাঁর মতে বাংলাদেশের সমাজে ছেলে সবসময় তার মা-বাবাকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাকে আশ্রয় দেয়। অন্যদিকে একটি মেয়ে তার বিয়ের পর

স্বামীর ঘরে চলে যায়। সে তার বাবা-মা'কে তেমন কোন সাহায্য করতে পারে না। তার বিয়েটাও বিরাট এক খরচের ব্যাপার, বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ ব্যাপক। বাংলাদেশ ও ভারতে মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদানের এক বিব্রতকর প্রথার ফলে বাবা-মা'কে পোহাতে হয় এক বিশাল আর্থিক ধকল।

৩.২ বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ হওয়ায় ছেলেরা খুব অল্প বয়স থেকেই কৃষি জমিতে শ্রম দেয়। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার উপর এক গবেষণায় দেখা যায় একটি ১২ বছরের শিশু যা খায় তার বেশী সে উপার্জন করে।[৭] তা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরে গার্মেন্টস ও ধোলাইখাল-জিঞ্জিরা মার্কা ফ্যাক্টরীগুলোতে শিশু শ্রমিকরা কাজ করতে পারে ব্যাপক সংখ্যায়। ফলে বিশেষ করে পুত্র সন্তান এ ক্ষেত্রে একটি লাভজনক বিষয়।

৩.৩ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু সমাজে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের আরও অনেক কারণ রয়েছে। যেমন ঃ পুত্র সন্তানেরা পরিবারের নাম বহন করে, পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। যে সকল দেশে কনফুসিয়াস মতবাদের প্রভাব রয়েছে সেসব দেশে পিতার বড় পুত্রই পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধাগুলের নেতৃত্ব দেয়। কোন পরিবারের পুত্র সন্তান না থাকলে ঐ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই এ সকল সমাজে একজন মহিলার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়া। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে এ কারণগুলো যথার্থ।[৮]

৩.৪ পুত্র সন্তান পছন্দ করার অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ধাতৃবিজ্ঞান বিশারদ ইউন-এ ই (Yun-Ae Yi)[৯] বলেন, মায়েরা উপার্জনের দিক থেকে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের কাছ থেকেই টাকা-পয়সা বেশী পায়। তাই গবেষণায় দেখা যায় একজন মায়ের কাছেও মেয়ে সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের চাহিদাই বেশী।

৪.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও আধুনিক প্রযুক্তি

৪.১ নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে একটি চমৎকার জৈবিক প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে সন্তানের আগমন ঘটে। গর্ভে অবস্থানের প্রায় তিন চার মাস পর যখন জীবনের অস্তিত্বের উপস্থিতি ঘটে, তখন এসব প্রযুক্তির সাহায্যে মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী সন্তানের সঠিকভাবে লিঙ্গ সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। বাংলাদেশী সমাজে লিঙ্গ সনাক্তকরণ বিষয়টি একটি প্রচন্ড সামাজিক বিরুদ্ধবাদী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এটা একটি প্রচন্ড 'ট্যাবু' বিষয়ও বটে। যারা বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনা করে, কোন কারণে মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান না থাকলে তখন গর্ভপাতের ব্যাপারটি তাদের সক্রিয় বিবেচনায় চলে আসে। সন্তান ধারণের বেশ কয়েকমাস পরে গর্ভপাত করাতে গেলে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। কাজেই এই প্রযুক্তির একটি

নেতিবাচক ফলাফল হলো এটা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ছাড়াও স্বাস্থ্যগত এমন কি বৃহৎ বিবেচনায় নারী প্রজনন স্বাস্থ্য তথা নারী অধিকারকেও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তোলে। শুধু বাংলাদেশে নয়, ১৯৬৭ সালের আগ পর্যন্ত সুইডেন এবং ডেনমার্ক ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল। বৃটেনে এটা আইন সিদ্ধ হয় ১৯৭০ সালে এবং আমেরিকায় ১৯৭৩ সালে। এখনও এর বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন প্রভৃতি দেশে 'Right to life' আন্দোলন চালু রয়েছে। বাংলাদেশে গর্ভপাতের বিষয়টি একটি নাজুক বিষয় বৈ-কি। তবে এখানে এম. আর. এর নামে গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এখন বাংলাদেশেও মাতৃগর্ভে সন্তানের অবস্থান ও লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় স্বাস্থ্য, প্রজনন, ফার্টিলিটি ছাড়াও এ দেশের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করছে, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

৪.২ সম্প্রতি এশিয়ার দেশগুলোতে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল জনসংখ্যার নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী জন্ম-পূর্ব শিশুর লিঙ্গের প্রাধান্য সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম (International symposium on sex' preference for children in the rapidly changing demogarphic dynamics in Asia)। এতে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, গর্ভপাত ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

৪.৩ এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই মেয়ে সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম হচ্ছে বেশী। ফলে লিঙ্গ অনুপাত হচ্ছে ১০০ জন মেয়ের জন্য ১০৪-১০৭ জন ছেলে। তবে এখনও ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার মেয়ে শিশুদের তুলনায় বেশী হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি ভারসাম্য অবস্থায় চলে আসে।[১০] বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার ছিল ৮৬ ও ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার ৯০[১১]।

৪.৪ যে সকল সমাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুত্র সন্তান চাওয়া হয় বা পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেয় হয়, সে সকল সমাজে শিশুদের লিঙ্গ অসাম্য বাড়তে পারে। কারণ অবহেলা বা অব্যবস্থার ফলে মেয়ে শিশুদের মৃত্যুহারও বেড়ে যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবারে মেয়ে শিশুকে হত্যাও করা হয়। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতের বিহার রাজ্যে। সেখানে দাইরা মাত্র ৫০ রুপির বিনিময়ে নবজাত মেয়ে শিশুকে হত্যা পর্যন্ত করে থাকে।[১২] মাতৃগর্ভে থাকাকালে শিশুর লিঙ্গ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার নির্বাচিত উপায়ে; বিশেষ করে মেয়ে শিশু গর্ভে থাকলে, তার abortion বা ভ্রুণ হত্যার হারকে যথেষ্ট মাত্রায় বাড়িয়ে তুলছে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি Asia-Pacific Population and Policy- তে মন্তব্য করা হয়েছে

যে, In several Asian countries the introduction to technologies to determine the sex of unborn fetused combined with the widespread availability of abortion has led to a record preponderance of male births, suggesting that couples are selectively aborting females" [১৩]

৪.৫ সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সন্তানের লিঙ্গ জেনে যাওয়ার প্রযুক্তির প্রচলন শুরু হয়েছে। ভ্রুণ অবস্থায় শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তি ১৯৮০-এর দশকে এশিয়ার অনেক দেশে চলে আসে। বর্তমানে লিঙ্গ সনাক্তকরণের ব্যাপারে তিন ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে; কোরিওনিক ভিলি স্যাম্পলিং (Chorionic Vilii Sampling), অ্যামনিও সেন্তেসিস (Amniocentesis) ও আল্ট্রাসাউন্ড (Altrasound)। এর মধ্যে আল্ট্রাসাউন্ড সবচেয়ে নিরাপদ প্রযুক্তি একক। এতে ব্যয় কম ও এটি বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি। আল্ট্রসাউন্ডের যন্ত্রপাতি প্রথম ব্যাপকভাবে তৈরী হয় ১৯৮০ এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়ায়। চীন এ যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শুরু করে ১৯৭৯ সালে। ভারতেও প্রায় ১০০ হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহৃত হয়। এ প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছিলো শিশুর কোন শারীরিক সমস্যা আছে কিনা তা দেখার জন্য।

৫.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও ফার্টিলিটি

৫.১ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও ফার্টিলিটির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পরস্পর ভিন্নধর্মী বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথম দিককার পর্যবেক্ষকরা পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন যে, পুত্র সন্তানের প্রাধান্য জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। কারণ দম্পতিরা তাদের ছেলে সন্তানের সংখ্যা কাঙিক্ষত মাত্রায় না পাওয়া পর্যন্ত সন্তান নিতে থাকবে। কয়েকটি গবেষণায় পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-১৯৯১ সালে তাইওয়ানে একটি জরিপে দেখা যায়, যে সকল দম্পতির দু'টি সন্তানের অন্তত একটি ছেলে, তাদের শতকরা ৯০জন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে। অন্যদিকে যাদের দু'টি সন্তানই মেয়ে তাদের শতকরা ৭৬ জন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে।[১৪]

৫.২ বাংলাদেশেও পুত্র সন্তানের প্রাধান্য জন্মনিরোধ সামগ্রীর ব্যবহারকে প্রভাবিত করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করেছে। এ আই. চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল পরিবারে পুত্র সন্তানের সংখ্যা বেশী সে সকল পরিবারের মহিলারা আর সন্তান চায় না।[১৫] এম. রহমান[১৬] তাঁর গবেষণায় বলেছেন পুত্র সন্তান লাভের আকাঙক্ষা বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ফার্টিলিটি কমানোর ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। আর. আমিন ও এ. জি. মরিয়মের[১৭] লেখায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের উপরও পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও

জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের উপর পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের একটি প্রতিকুল প্রভাব রয়েছে। আর ফার্টিলিটি নিয়ন্ত্রণের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব অনেক বছর ধরে বিদ্যমান।

৫.৩ অন্যদিকে আর. বৈরাগী[১৮] অবশ্য মতলবের দু'টি এলাকার উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের শক্তিশালী ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ফার্টিলিটির উপর এর প্রভাব খুব বেশী নয়। তবে এশিয়ার অনেক দেশেই; যেমন-তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের কারণে ফার্টিলিটির হার অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল।

৬.০ লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাত

৬.১ লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাত করার ফলে এশিয়ার দেশগুলোতে জন্মের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে চীন, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে তা বাড়তে শুরু করে। ১৯৯২ সালের ডাটা অনুসারে চীনে ১০০ জন মেয়ে প্রতি ছেলে হচ্ছে ১৮৯জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১১৪, তাইওয়ানে ১১০ ও ভারতে ১১২জন।[১৯]

৬.২ ১৯৮০-এর দশকে এসে দেখা যায় দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে যখনই লিঙ্গ অনুপাতের মধ্যকার ব্যবধান কমতে থাকে, তখনই লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কারণে তৃতীয় ও পরবর্তী সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রে ব্যবধান বাড়াতে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৮৯ সালে চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত ২০৯-এর অর্থ হচ্ছে এ জন্ম ধারায় একটি মেয়ে সন্তানের বিপরীতে দু'এর অধিক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। ১৯৯০ সালের দিকে তাইওয়ানে তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত ১৩৪ ও চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ১৫৯-এ দাঁড়ায়।[২০]

৬.৩ এ লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এখনও সমগ্র বিশ্বের লিঙ্গ অনুপাতের উপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েনি। তবে যে সকল দেশে ফার্টিলিটি কম, সে সকল দেশে প্রথম দিককার জন্ম সংখ্যায় লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কারণে দেশের জনসংখ্যার নারী-পুরুষের সংখ্যার ব্যাপক তারতম্য ঘটতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৯০ সালের মধ্যে মেয়ে সন্তান জন্মাতে এমন ৮০ হাজার গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। ঐ সময়কালে জন্ম নেয়া মোট মেয়ের সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ।[২১]

৬.৪ তবে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের ফলে সৃষ্ট লিঙ্গ অসাম্য সাময়িক হতে পারে। কেননা দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রথম শিশুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত বাড়লেও দ্বিতীয় শিশুর জন্মের ফলে এ অনুপাত কমে যায়। ১৯৯১ সালে এক জরিপে দেখা যায়, সমাপ্ত ফার্টিলিটির ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানের জন্য লিঙ্গ অনুপাত ১১৮, দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হওয়ার কারণে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে ১০৪

এবং দ্বিতীয় সন্তান ছেলে হওয়ার কারণে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে অনুপাত ৯৪। কিন্তু ১৯৯৩ সালে এসে দেখা যায় দক্ষিণ কোরিয়ায় এ অনুপাত ১১৫.৬ জন ছেলে প্রতি মেয়ে ১০০জন। এ ব্যবধান বাড়ার কারণ হচ্ছে ব্যাপক হারে লিঙ্গ নির্ধারণ পূর্বক গর্ভপাত।[২২] এশিয়ার অনেক দেশের মত দক্ষিণ কোরিয়ানরা প্রথমে পুত্র সন্তান ও পরে মেয়ে সন্তান গ্রহণ করতে চায় এবং দম্পতিরা লিঙ্গ নির্ধারণ-পূর্বক গর্ভপাতের মাধ্যমে তাদের পরিবারের বিন্যাস ঠিক করে।

৬.৫ চীনের ক্ষেত্রেও এ লিঙ্গ অনুপাত ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। স্বল্পোন্নত পল্লী অঞ্চলে লিঙ্গ অনুপাত কম, উন্নত অঞ্চলগুলোতে বেশী এবং তুলনামূলকভাবে মডারেট সিটিগুলো; যেমন-সাংহাই ও বেইজিং-এ কম। এ বড় শহরগুলোর প্রবণতা ভবিষ্যতে গোটা চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[২৩]

৬.৬ বাংলাদেশে গর্ভপাত সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। তবে এম. আর. করার অনুমতি রয়েছে। ফলে এম. আর. এর নামে এ দেশেও নির্বিবাদে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। এ গর্ভপাতের পরিমাণ সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়না। এ গর্ভপাতের মধ্যে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতও একটি বড় বিষয়।

৭.০ নীতি ও সুপারিশ

৭.১ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তির ভবিষ্যত প্রভাব নিয়ে চিন্তিত এবং বিষয়টি এখন বিভিন্ন ফোরামে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কোন কোন দেশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৮৭ সালে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য 'ভ্রূণ নিরীক্ষা প্রযুক্তি'র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাস্থ্য ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পরীক্ষায় জড়িত ডাক্তারদের জরিমানা বৃদ্ধি করে এবং এ জন্য ৮জন ডাক্তারের মেডিক্যাল লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ১৯৯৪ সালে মেডিক্যাল কোড আরও শক্তিশালী করা হয়। যে সকল ডাক্তার এ পরীক্ষা করবে তাদের এক বছর সাজা, ১২০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং তাদের মেডিক্যাল লাইসেন্স বাতিল করার বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের তথ্যানুসারে দেখা যায় এ জরিমানা বৃদ্ধি করে তা ১৩০০০ মার্কিন ডলার ও কারাদন্ডের ব্যপ্তি দুই বছরের স্থলে তিন বছরে বৃদ্ধি করা হয়েছে।[২৪]

৭.২ ১৯৮৯ সালের মে মাসে চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি নোটিশের মাধ্যমে জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। চীনে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য দূর করার জন্য বাবার পরিবর্তে মায়ের নামে পরিবারের নামকরণ প্রথা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

৭.৩ ১৯৮৩ সালে ভারতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে এ লিঙ্গ নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সম্প্রতি ভারতীয় সংসদ এই বলে একটি বিল পাশ করেছে যে, জেনেটিক সমস্যা নির্ধারণ করার জন্যই কেবল এ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যাবে।

যদিও এ জন্য আইনগত কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ তবে কিছু পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিকে বরং বিক্ষিপ্ত ও ব্যয়বহুল করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন[২৫] ১৯৯৩ থেকে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আনাড়ী গর্ভপাতের কারণে প্রতি বছর কমপক্ষে ৬০ হাজার মহিলা মারা যায়। এ সকল দেশে গর্ভপাত অবৈধ হওয়ায় এ মহিলাদের অনেকেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেনা।

৭.৪ সিউল সিম্পোজিয়ামে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সরকারি পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ও সুপারিশ পেশ করেছেন, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ও যথার্থ। সুপরিশগুলো হচ্ছেঃ

- লিঙ্গভেদে বৈষম্য দূর করার জন্য নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। যেমন- বৈষম্যমূলক আইন, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার প্রথা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা, পার্থক্যমূলক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রবেশাধিকার, প্রভৃতি বাতিল করা।
- জন্ম পূর্ববর্তী পরীক্ষা যাতে লিঙ্গ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে না করা হয় তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা তৈরীর জন্য নীতিমালা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ডায়ালগের উদ্যোগ নেয়া।
- লিঙ্গ সংক্রান্ত সমতা আনার জন্য গণমাধ্যম, ফোক মিডিয়া, আন্তঃব্যক্তিক মাধ্যম, স্কুল কারিকুলামসহ তথ্য প্রবাহের সব ধরনের চ্যানেল ব্যবহার করা।
- ছেলে সন্তানের প্রাধান্য ও জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মেডিকেল কলেজগুলোর কারিকুলামের নীতিমালা শক্তিশালী করা।
- পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়ানো।
- সর্বোপরি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট পেশা ও সেবার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের নৈতিক অবস্থান দৃঢ় করা ও এতদসংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ।

তথ্যসূত্রঃ

১. শিকদার, সামাদ '*'নারীর মর্যাদা ও প্রজনন স্বাস্থ্য আনে উন্নয়ন'*'-প্রজন্ম পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। বর্ষ ১৪, সংখ্যা ১০। ১৯৯৫ পৃষ্ঠা৬-১২।

2. Khua. Barkat-e et al. *Literature review for the development of the National FP-MCH IEC Strategy in Bangladesh.* University Research Corporation (Bangladesh). Dhaka. 1992. PP I-VI.

3. Rogers. E. M. *Communication Strategies for Family Planning* The Free Press. New York. 1973 P2-3.
4. Zopf (Jr) Paul E. *Population An Introduction to Social mayfield* publishing Company (Firit Edition). 1984. PP57-66.
5. Khud. Barkat-e Et. al op cit.
6. mannan. M. A. *"Seyval Division of Labour and Son preference in Rural Bagnladesh in Demography India.* Hindustan publishing Corpn (India) Vol. 17 (2) 1988. pp. 242-272.
7. Westly. Sidney B. *"Evidence mounts for Sex Selective Abortion in Asia"* in Asia-Palific population & policy. East West centre. Honolulu. No. 34. 1995. pp. 1-4.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. *Human Development Report.* UNDp. Dhaka. Bangladesh 1992.
১২. মনীরুজ্জামান। *''বিহারের ট্রাজেডি মেয়ে সন্তান হত্যাঃ'' যায় যায় দিন* বর্ষ ১১, সংখ্যা ২১। ১৯৯৫ পৃঃ ১২-১৩।
13. Westly. Sidney B. op. cit.
14. Ibid.
15. Chowdhury A. I et. al. *"Effects of Family Sex Composition on Fertility preference and Behaviour in Rural Bangladesh"* in Journal of Biosocial Science. The Bissouial Socity. England. Vol 25 (4) 1993 pp. 455-462.
16. Rahman. M. Gendeer Preference. *Fertility Behaviour and Excess Female Child mortality in Matlab,* Bangladesh. Doctoral Dissertation. John Hopkins University. U. S. A. 1991
17. Amin. R. et. al. *"Son preference an Bangladesh An Emerging Barrier to Fertility Regulation"* inJournal of Biosocial Science. The Biosocial Society. England. Vol 19 (2) 1987. PP 221-28.
18. Bairagi. R. *"Is gender Preference an obstacle to the success fo Family planning Programms in Rural Bangladesh"* Presecr in international population conference. Mortreal. Aug. 24-Sept. 01. 1993. Compilw by international Union for the Scientific Study on popalation. Liege. Belgium. Vol. I. pp. 121-34.
19. Westly. Sidney B. op. cit.
20. Ibid.
21. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. *Population Headliners* population Divdision. ESCAP. Bankik August. 1995. P.4
25. ***World Development Repost*** **world Bank. 1993.**

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

প্রশিক্ষণ-মূল্যায়ন ঃ পরিধি, পদ্ধতি ও কৌশল

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা *

১.০ ভূমিকা

১.১ মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ভ্যালেরা (Valera)হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হল শক্তিশালী এবং Evaluation শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মূল্য। তাই মূল্যায়ন বলতে আমরা কোন কিছুর শক্তি বা মূল্য বুঝি। মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন কর্মসূচি; কর্মসূচির শক্তিশালী দিক বা দুর্বলদিক চিহ্নিত করা বোঝায়।

১.২ প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ মূল্যায়ন (Evaluation)। অন্যদিকে মূল্যায়ন হল প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমের মূল্য নিরূপণ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের যথার্থতা (Validation) এবং মূল্যায়ন (Evaluation) কে পৃথকভাবে বিচার করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সক্ষম হল, তা নির্ধারণ হচ্ছে Validation; অপরদিকে প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বা ফলপ্রসূতা নিরূপণ হল Evaluation। অতএব পাঠদানের বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থার সংগে পাঠদানের বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরের অবস্থার ব্যবধান/পরিবর্তন বের করার প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন বলে। একটি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে অনেক প্রকারের মূল্যায়ন হতে পারে। এগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন, ফলাফল মূল্যায়ন, কৃতি মূল্যায়ন/ প্রভাব মূল্যায়ন, মনোভাব দক্ষতা মূল্যায়ন, বক্তৃতা মূল্যায়ন, ব্যবহৃত সামগ্রী মূল্যায়ন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সম্ভবত কোন সংশয় নেই; অস্পষ্টতা থাকতে পারে মূল্যায়নের পরিধি ও পর্যায় সম্পর্কে, মতদ্বৈধতার সুযোগ রয়েছে এর পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে।

১.৩ প্রধানত তিনটি কারণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো হল ঃ

ক. দায়িত্ব ঃ অধিকাংশ প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি মূল্যায়নের বিষয়টি তাদের নিয়মিত দায়িত্বের আওতায় পড়ে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় কেবল

* অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

দায়িত্ব পালনের খাতিরেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়।

খ. যৌক্তিকতা ঃ চলতি কার্যক্রমের যৌক্তিকতা নিরূপণের জন্যও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে কি-না।

গ. উন্নয়ন ঃ বিদ্যমান কার্যক্রমের উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে যে ফলাবর্তন (feedback)পাওয়া যায়, সেগুলো প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমের উন্নয়নে কাজে লাগানো হয়।

প্রশিক্ষণ-জগতের কল্পকথা (myth)
১. প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতার পরিমাপ সাধ্যাতীত ২. কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তা অজ্ঞাত ৩. প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ থেকে কী লাভ হবে জানা নেই; সুতরাং এর মূল্যায়নও অর্থহীন ৪. কেবল উৎপাদনমুখী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই কাজের পরিমাপ সম্ভব ৫. কর্তপক্ষ মূল্যায়নে আগ্রহী নন; সুতরাং আমার এ কাজে প্রয়োজন কী? ৬. কর্মাচরণ-পরিবর্তনের পেছনে কারণ অনেক; কাজেই প্রশিক্ষণের প্রভাব বুঝব কী করে? ৭. মূল্যায়ন কেবল সমালোচনা ডেকে আনে ৮. আমাদের প্রতিষ্ঠান স্থায়ী; সুতরাং এর মূল্যায়ন অর্থহীন ৯. মূল্যায়নের গুরুত্ব সকল প্রতিষ্ঠানেই সমান এ কল্পনার অবসান চাই, কারণ : ১. বর্তমানে সবকিছুরই পরিমাপ সম্ভব: শুধু ভাবতে হবে, মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি-না। ২. প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের ধরনই বলে দেবে কী তথ্য আমার চাই ৩. প্রশিক্ষণের লাভ জানা সম্ভব, কেবল মূল্যায়নের ব্যয় প্রত্যাশিত লাভের সমানুপাতিক হওয়া চাই ৪. কাজের পরিমাপ সর্বদাই সম্ভব, শুধু পদ্ধতি ভিন্ন ৫. কর্তৃপক্ষ আজ না হলেও আগামীকাল মূল্যায়নে আগ্রহী হতে পারেন ৬. বিভিন্ন কারণ আলাদা করে প্রশিক্ষণের প্রভাব নির্ণয় সম্ভব

৭. সমালোচনা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে ৮. কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সুনামও নয় ৯. মূল্যায়নের গুরুত্ব সকল প্রতিষ্ঠানেই সমান, তবে মূল্যায়নের ব্যাপকতা ও ধরন এক হবে না সূত্র ঃ জ্যাক পিলিপস, ১৯৮৩

২.০ মূল্যায়নের পরিধি

২.১ প্রশিক্ষণের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন বলতে অনেকে কেবল প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির মূল্যায়ন বোঝালেও প্রকৃতপক্ষ মূল্যায়নের চারটি প্রধান দিক রয়েছে। এগুলো হল ঃ

ক. প্রশিক্ষক-মূল্যায়ন ঃ মূলত এর মাধ্যমেই মূল্যায়ন-কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়ন করেন। 'প্রশিক্ষক' বলতে এখানে বক্তা, সহায়ক (facilitator), প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাপক তথা প্রশিক্ষণ-কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকলকে বোঝানো হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণার্থী-মূল্যায়ন ঃ প্রশিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকলে তারা প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির প্রতি বেশি মনোযোগী হয়। ফলাফল জানতে পারলে তাদের আগ্রহ ও মনোযোগের মাত্রা বেড়ে যায়।

গ. কর্মসুচি-মূল্যায়ন ঃ কর্মসূচি মূল্যায়নের আওতায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী, পাঠসূচি, প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ-উপকরণ, সহায়ক-কৃত্যক (support service) প্রভৃতির প্রাসঙ্গিকতা/উপযোগিতা/যথার্থতা/দক্ষতা যাচাই।

ঘ. কর্মদক্ষতা-মূল্যায়ন ঃ এটি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কর্মক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মনোনয়নকারী প্রতিষ্ঠান কতটুকু লাভবান হয়েছে, এক্ষেত্রে তাই নিরূপণ করা হয়।

২.২ ডঃ ডন কার্কপ্যাট্রিক প্রশিক্ষণ-মূল্যায়নের চারটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার চারটি প্রধান স্তর বা পর্যায়ে এ ক্ষেত্রগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. প্রতিক্রিয়া-স্তর (The Reactions Level) ঃ প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া যাচাই হল এ স্তরের

মূল্যায়ন। এ স্তরে পাঠ্যবিষয়েব প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও উপভোগ্যতা এবং মনোভাব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া দেখা হয়।

খ. শিক্ষণ-স্তর (The Learning Level)ঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের প্রসার কতটুকু ঘটল, কতটুকু দক্ষতা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটল, তা নিরূপণই এ স্তরের মূল্যায়ন। এ কাজটিও প্রশিক্ষণ চলাকালে করা হয়; জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের প্রশ্নটি এ পর্যায়ে আসে না।

গ. কর্মাচরণ-স্তর (Job Behaviour Level) ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণ-শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের পর প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মাচরণে কী পরিবর্তন হল, এ স্তরে তারই মূল্যায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজের ধারা, প্রণোদন (motivation) এবং সহকর্মী ও ভোক্তাদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর কর্মাচরণ প্রকাশ পাবে।

ঘ. কর্মদক্ষতা-স্তর (The Functioning Level) ঃ প্রশিক্ষণ তথা পরিবর্তিত কর্মাচরণের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, লাভের অঙ্ক কিংবা সেবার মান কতটুকু বৃদ্ধি পেল, এ স্তরে সেটিই মূল্যায়ন করা হয়। প্রসারিত দৃষ্টিকোণ হতে কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিভিন্ন কারণে এটি দুঃসাধ্য। এর মধ্যে একটি কারণ হল, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পেছনে প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য উপাদান সক্রিয় থাকতে পারে।

২.৩ প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন থেকে সুফল পেতে হলে অব্যাহতভাবে প্রতিটি স্তরে প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করতে হয়। কেবল একটি স্তরের মাধ্যমে কোন প্রশিক্ষণার্থীর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কারণ, একজন প্রশিক্ষণার্থী সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেই যে তিনি যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার ভালভাবে প্রশিক্ষণ নিলেই যে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মাচরণ যথার্থ হবে, তাও নিশ্চিত নয়। তদুপরি, একজন ব্যক্তির কর্মাচরণে প্রশিক্ষণের প্রতিফলন ঘটলেও তাতে প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠান লাভবান নাও হতে পারে।

৩.০ প্রশিক্ষক মূল্যায়নের পদ্ধতি

এ পর্যায়ের আলোচনায় প্রথমেই প্রশিক্ষক মূল্যায়ন-এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। নবীন প্রশিক্ষকদের মধ্যে এক প্রকার মূল্যায়ন-ভীতি কাজ করে। মূল্যায়ন আশাব্যঞ্জক না হলে কখনো কখনো তা বিব্রতকর হয়। নবীন প্রশিক্ষকদের মধ্যে কখনো কখনো আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত মূল্যায়নের কাজটি যদি প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরিণত প্রশিক্ষকগণ মূল্যায়নের

মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাবর্তনকে আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন। প্রশিক্ষক মূল্যায়নের কাজ দু'ভাবে হতে পারে। যেমন,

ক. প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ প্রশিক্ষণ-চলাকালে প্রশিক্ষক কোনকিছু যতটুকু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তার চাইতে বেশি পারেন প্রশিক্ষণার্থীগণ। সুতরাং তাদের ক্ষমতাকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই। প্রশিক্ষণার্থীগণ সাধারণত পেশাদার প্রশিক্ষক হন না; সুতরাং প্রশিক্ষণ-পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের মতামত ততটা মূল্যবান নয়। কিন্তু সার্বিকভাবে প্রশিক্ষকের উপস্থাপন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত মূল্যবান। প্রশ্নপত্র তথা মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে এ মতামত নেয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। (সম্ভাব্য প্রশ্নের একটি তালিকা সারণি ১-এ দেয়া হল)।

সারণি ১ঃ প্রশিক্ষক-মূল্যায়নে প্রশিক্ষণার্থীদের বিচার্য বিষয়

১. বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রশিক্ষকের সামর্থ্য
২. অধিবেশনের উদ্দেশ্যাবলী স্পষ্ট ছিল কি-না
৩. প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ
৪. প্রশিক্ষকের ভাষা ও বর্ণনার স্পষ্টতা
৫. অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি
৬. প্রশিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণ ও ব্যক্তিত্ব
৭. প্রশ্নোত্তরে প্রশিক্ষকের দক্ষতা
৮. প্রশিক্ষকের পক্ষ থেকে সহযোগিতার মনোভাব
৯. প্রশিক্ষক তাঁর মূল বক্তব্য স্পষ্ট করতে পেরেছেন কি-না
১০. প্রশিক্ষকের কী কী ভাল লেগেছে
১১. প্রশিক্ষকের কী কী ভাল লাগেনি

খ. বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ বিষয়বস্তুর গভীরতা ও প্রশিক্ষণ-পদ্ধতির খুঁটিনাটি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও পেশাদার প্রশিক্ষক। তাঁরা উপস্থাপককে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলাদা প্রশ্নপত্রের সাহায্যে এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন। (তাঁদের জন্য ব্যবহার্য প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে সারণি ২-এ উল্লিখিত তালিকা কাজে লাগতে পারে।)

সারণি ২ঃ প্রশিক্ষক-মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের বিচার্য বিষয়

১. অধিবেশনের উদ্দেশ্য স্পষ্টীকরণ

২. প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়, পূর্ব অভিজ্ঞতা (background) ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ছিলেন কি-না।

৪. যথাযথ প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ

৫. যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার

৬. পাঠ-পরিকল্পনা ও উপস্থাপন-কাঠামো

৭. বিষয়বস্তুর ওপর দখল

৮. দেহভঙ্গি ও শব্দ প্রক্ষেপণ

৯. বক্তব্যের উপসংহার টানা হয়েছে কি-না

১০. অধিবেশনের ওপর প্রশিক্ষকের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ

১১. প্রশিক্ষকের উন্নয়নে সুপারিশ

৪.০ প্রশিক্ষণার্থী-মূল্যায়নের পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ-বিশেষজ্ঞগণ প্রশিক্ষণার্থী-মূল্যায়নকে মুখ্যত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করেছেনঃ প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিক্রিয়া, অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি প্রশিক্ষক ও কর্মসুচি মূল্যায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশ্নপত্রের সাহায্যে এ মূল্যায়ন করা যায়। নিম্নে তিনটি ক্ষেত্র সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল ঃ

ক. প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিক্রিয়া ঃ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ-কর্মসুচি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য তৈরি প্রশ্নপত্র এমন হওয়া উচিত, যাতে উদ্যোক্তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়াবলী ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। (একটি নমুনা প্রশ্নপত্র চিত্র ১-এ দেখানো হল।)

চিত্র ১ ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ছক

পাঠক্রমের নাম--তারিখ----------------

বিষয়--

বক্তার নাম---

আপনার মতামত আমাদের কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা, উপযোগিতা ও উপভোগ্যতা নিরূপণে সহায়ক হবে। আমাদের কর্মসূচির মানোন্নয়নেও এটি কাজে লাগবে।

ক. বিষয় সম্পর্কে মতামতঃ

অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

০ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

০ প্রয়োজনীয়

০ মোটামুটি প্রয়োজনীয়

০ তেমন প্রয়োজন নেই

০ অপ্রয়োজনীয়

খ. বক্তা সম্পর্কে মতামতঃ

অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি থাকে) ঃ

০ অত্যন্ত কার্যকর

০ কার্যকর

০ মোটামুটি কার্যকর

০ তেমন কার্যকর নন

০ অকার্যকর

গ. অধিবেশনের কোন্ (কোন্) দিক আপনার কাছে বেশি মূল্যবান মনে হয়েছে?

ঘ. সুপারিশ (যদি থাকে)ঃ

খ. অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের প্রধান চারটি পদ্ধতি হল লিখিত পরীক্ষা, প্রদর্শনী (demonstration), সমস্যার সমাধান এবং রোল প্লে। লিখিত পরীক্ষার

মাধ্যমে মূলত তাত্ত্বিক ও তথ্যগত জ্ঞান যাচাই করা যায়। প্রদর্শনীর মাধ্যমে দক্ষতা (skill) পরিমাপ করা যায়। দলগত আলোচনার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে দিলে বোঝা যায় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে কতটুকু সক্ষম। রোল প্লের সাহায্যে শেষোক্ত কাজের আরো বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন সম্ভব। প্রশিক্ষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও ফীডব্যাক প্রদান শেষোক্ত দু'টি পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ-পূর্ব এবং প্রশিক্ষণ-উত্তর-এ উভয়বিধ মূল্যায়ন প্রয়োজন। শুধু প্রশিক্ষণ-উত্তর মূল্যায়নের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ সম্ভব, কিন্তু এর কতটুকু বিবেচ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তা জানা সম্ভব নয়।

গ. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঃ দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হল মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা (psychological test), কিন্তু প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হল রোল প্লে (role Play)। প্রদর্শনীর সঙ্গে রোল প্লে'র অনেকাংশে মিল রয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, রোল প্লে'তে প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই অন্যদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া (interaction) করতে হয়। প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও প্রশিক্ষণ-উত্তর রোল প্লে'তে প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যাচাই করা যায়।

৫.০ কর্মসূচি-মূল্যায়নের পদ্ধতি

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নের পর কর্মসূচি মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক বিষয় বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। এগুলো হল ঃ

ক. প্রাসঙ্গিকতা ঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণের প্রকৃষ্ট উপায় হল কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলীর নিরিখে সেগুলো যাচাই করা। এক একটি উদ্দেশ্য হাতে নিয়ে সেটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিটি বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এভাবে সবক'টি উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল বিষয় যাচাই করার পরও যদি কোন বিষয় অচিহ্নিত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, বিষয়টি কিংবা বিষয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক। অপরদিকে যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন বিষয় পাওয়া না যায়, তাহলে বুঝতে হবে, এ কর্মসূচির মাধ্যমে ওই উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে না। (সারণি ৩-এ প্রদত্ত তালিকা এ কাজে সহায়ক হতে পারে।)

সারণি ৩ ঃ প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা-নির্ণায়ক

১. কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কি-না।
২. বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী পরিমাপযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কি-না
৩. পাঠ্য বিষয়সমূহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পূনর্বিন্যাসের অবকাশ রয়েছে কি-না
৪. প্রশিক্ষণ-পদ্ধতিসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না
৫. প্রশিক্ষণার্থীদের লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাঁচাই করার ব্যবস্থা রয়েছে কি-না
৬. কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে কি-না
৭. গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে কি-না

খ. উপভোগ্যতা ঃ কর্মসূচীর বিভিন্ন অংশের উপভোগ্যতা যাচাই করা যায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া থেকে। প্রশিক্ষণার্থীদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ছাড়াও তাঁদের সামগ্রিক আগ্রহ, মনোযোগ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের মাত্রা থেকে কর্মসূচি কিংবা বিষয়বস্তুর উপভোগ্যতা মূল্যায়ন করা যায়।

গ. উপযোগিতা ঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপযোগিতা নির্ভর করে প্রশিক্ষণার্থীর কর্মক্ষেত্রে তা কতটুকু কাজে লাগবে, তার ওপর। মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের সাহায্যে দু'টি পর্যায়ে এ উপযোগিতা যাচাই করা যায়। প্রথমত, প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণার্থীর বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে, সে সম্পর্কে তাঁকে কর্মসূচি চলাকালেই জিজ্ঞাসা করা যায়। দ্বিতীয়ত, কর্মসূচির সমাপনী মূল্যায়নের প্রশ্নমালায়ও প্রসঙ্গটির উল্লেখ থাকবে।

৬.০ কর্ম দক্ষতা-মূল্যায়নের পদ্ধতি

কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের পর্যায়ে প্রধানত দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে হয় ঃ একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মাচরণগত পরিবর্তন, অপরটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কিংবা সেবার মানে পরিবর্তন। প্রশিক্ষণ-পূর্ব কর্মদক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ-উত্তর কর্মদক্ষতার পার্থক্য পরিমাপের মাধ্যমে এ মূল্যায়ন সম্ভব। এটি হতে পারে উর্ধ্বতন, অধস্তন ও সমপর্যায়ের সহকর্মী ও ভোক্তা (client) দের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে। (কর্মাচরণে ও উৎপাদন/সেবার পরিবর্তন পরিমাপে ব্যবহারযোগ্য নির্ণায়কের একটি সম্ভাব্য তালিকা সারণি ৪-এ দেখা যেতে পারে।)

সারণি ৪ ঃ কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের নির্ণায়ক

ক. কর্মাচরণের পরিবর্তন	খ. উৎপাদন/সেবায় পরিবর্তন
১. নতুন জ্ঞান ব্যবহারে আগ্রহ	১. কাজের পরিমাণ
২. নুতন দক্ষতা প্রয়োগে আগ্রহ	২. কাজের গুণগত মান
৩. কাজের মানোন্নয়নে স্পৃহা	৩. আনুপাতিক ব্যয়
৪. উৎসাহ ও উদ্যম	৪. মুনাফা/সেবা বৃদ্ধি
৫. অধ্যবসায়ী মনোভাব	৫. কাজের দ্রুততা
৬. শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতা	৬. ভুলত্রুটির মাত্রা
৭. সততা ও নিষ্ঠা	৭. সম্পন্ন কাজ/প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অভাব অভিযোগের মাত্রা
৮. সামষ্টিক চেতনা	৮. অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মনোবল
৯. সহযোগিতা ও সহমর্মিতা	৯. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সন্তোষের মাত্রা
১০. সেবার মনোবৃত্তি	১০. সৃজনশীলতার মাত্রা
১১. সৌজন্য ও শিষ্টাচার	১১. জনসংযোগ-পরিস্থিতি

৭.০ মূল্যায়ন-কৌশল

৭.১ বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের পদ্ধতি ওপরে আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক। স্বাভাবিকভাবেই সব কর্মসূচির মূল্যায়ন-পদ্ধতি এক হবে না। এটি নির্ভর করবে কর্মসূচির ধরন, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়, এমনকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যাবলীর ওপর। (কোন্ ক্ষেত্রে কী কৌশল অনুসরণ করা সমীচীন, সারণি ৫ থেকে তার একটি দিক্ নির্দেশনা পাওয়া যাবে।)

সারণি ৫ ঃ মূল্যায়ন কৌশল

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের কৌশল
১. জ্ঞানার্জন	ঃ প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও প্রশিক্ষণ-উত্তর লিখিত পরীক্ষা
২. দক্ষতা বৃদ্ধি	ঃ প্রদর্শনী, অনুশীলনী
৩. আচরণগত পরিবর্তন	ঃ পর্যবেক্ষণ
৪. কর্মদক্ষতায় পরিবর্তন	ঃ কর্ম-প্রতিবেদন (Work reports)

৫. প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীর ধারণা	ঃ প্রশ্নপত্র (Questionnaire)
৬. প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে খোলাখুলি মতামত	ঃ সাক্ষাৎকার
৭. প্রশিক্ষণার্থীর ফলপ্রসূতা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ধারণা	ঃ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার rating

৭.২ প্রশিক্ষণ-মূল্যায়নে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র, সাক্ষাৎকার, লিখিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এ চারটি কৌশলই প্রধান। এর মধ্যে প্রশ্নপত্রই সর্বাধিক প্রচলিত। নাম প্রকাশে বাধ্যবাধকতা না থাকলে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনেক সত্য কথা বের হয়ে আসে। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ছাড়াও তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও আবেগ অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। সাক্ষাৎকার-এর বড় সুবিধা হল এর নম্যতা (flexibility)। এর মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের বাইরেও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রশ্নপত্রে কোন দুর্বোধ্যতা থাকলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার স্পষ্টীকরণ সম্ভব। প্রশিক্ষণার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছেন, তা মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাতে কেবল প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যগত জ্ঞান নয়, উপলব্ধিও (comprehension) যাচাই করা যায়। পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যাতে প্রশিক্ষণের প্রতিটি দিক সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞানের মাত্রা পরিমাপ করা যায়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত হলেও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীরা সর্বদাই মৌখিকভাবে কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। এসব প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষক মূল্যবান ফীডব্যাক পেতে পারেন। এর সাহায্যে প্রশিক্ষক প্রয়োজনবোধে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর শিক্ষণ-কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন।

৮.০ উপসংহার

৮.১ প্রশিক্ষণ-জগতে মূল্যায়ন একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও মূল্যায়নের পরিধি, পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে যথেষ্ট সংশয় বিদ্যমান। বাংলাদেশে, বিশেষ করে সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ-মূল্যায়নে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন বলতে প্রধানত প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষণ-এ দু'টি স্তরের মূল্যায়নকেই বোঝায়। প্রতিক্রিয়া স্তরে সাধারণত প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকগণকে মূল্যায়ন করেন এবং শিক্ষণ স্তরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মূল্যায়ন করা হয়। কর্মসূচির শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে সমাপনী মূল্যায়ন করে থাকেন, তাও প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়া পর্যায়েই পড়ে। প্রশিক্ষণ-উত্তর কর্মাচরণ ও কর্মদক্ষতা

মূল্যায়নের বিষয়টি এখনো তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি-যদিও এটি ছাড়া সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলপ্রসূতা নির্ণয় যৌক্তিক হবে না।

৮.২ প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যে মূল্যায়ন করেন, তার বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সংশয় প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। বিশেষত সরকারি খাতে কর্মজীবন-পরিকল্পনার সঙ্গে প্রশিক্ষণের সীমিত সম্পর্ক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণে অনেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগদান করেন না। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কাজের সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক ও মানরূপ (performance critera and standards) না থাকায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের যথার্থতা যাচাই করা দুঃসাধ্য। এ অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যায়ন বহুলাংশে উপভোগ্যতা নিরুপণ-এ পর্যবসিত হয়। ডোনাল্ডসন ও স্ক্যানেল তাকে happiness rating হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, এ পরিস্থিতি তার অনুরূপ।

৮.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়নকে আরো কার্যকর করতে হলে কর্মাচরণ ও কর্মদক্ষতা পর্যায়ের মূল্যায়ন অপরিহার্য। যে সব সংস্থা প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দেন, অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীর কর্মাচরণ ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে হলে মনোনয়নকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ নিবিড় করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্মাচরণ ও কর্মদক্ষতায় কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রশিক্ষণের খাতিরে প্রশিক্ষণ মোটেও কাম্য নয়, যথার্থ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন এবং সেটি প্রশিক্ষণার্থীর নিজের, তাঁর প্রতিষ্ঠানের এবং চূড়ান্তভাবে সমাজের।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Donaldson, L. and Edward E. Scannell, *Human Resources Development : The New Trainer's Guide (2nd ed)*, Addison-Wesley Publishing Company, Ine, Reading, 1086.

Kirkpatrick, Donald L., *Evaluating Training Programmes*, ASTD Press, Washington, D. C., 1975.

Laird, Dugan D., *Approaches to Training and Development, (2nd ed)*, Addison -Wesley Publishing Company, Ine, Reading, 1985.

Watson, Charles E., *Management Development Through Training, (5th ed)*, Addison-Wesley Publishing Company, Ine, Reading, 1985.

Craig, Robert L. (ed), *The Training and Development Handkbook, (2nd)* McGraw-Hill Book Company, New York, 1976.

Phillips, Jack J., *Handbook of Training Evaluation and Management Method.*, Gulf Publishing Company, Houston, 1983.

Chowdhry, D. Paul, *Handbook of Training Methodology and Management*, Inter-India Publications, New Delhi, 1994.

Robinson, Kenneth R, A *Handbook of Training Management, (2nd ed)*, Kogan page Ltd, London, 1985.

Warren, Malcooln W., *Training for Results, (2nd)*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1984.

Virmani, B. R. and P. Seth, *Evaluating Management Training and Development*, Vision Books, New Delhi, 1983.

Rae, L., How teo Measure *Training Effectiveness*, Gower publsishging Company Ltd, Hants, 1987.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ ও নির্বাচন ঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার নাইমুল ইসলাম *

১.০ ভূমিকা

১.১ কর্মী ব্যবস্থাপনা তথা যে কোন সংগঠন/প্রশাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ ও নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক/প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রয়োজন কর্মী। প্রশাসন তথা সংগঠনের চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও কার্যকর নিয়োগ ও নির্বাচন নীতি, পদ্ধতি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার নিয়োগ ও নির্বাচনের পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে এবং তা দূরীকরণে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.২ "Good people are hard to find, hard to develop and hard to keep"-Anon.

কর্মচারী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কর্মী নিয়োগ। সাংগঠনিক কার্যক্রমের যথোপযুক্ত লক্ষ্য অর্জনে, দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, সর্বোপরি সাংগঠনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা বজায় রাখতে কর্মী নিয়োগ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। যে কোন সামাজিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম অব্যাহত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যথোপযুক্ত কর্মী নিয়োগের মাধ্যমেই সংগঠন শুধু তার সচলতা বজায় রাখতে পারে। সাংগঠনিক কার্যক্রমে কর্মী নিয়োগ তাই কর্মচারী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌল বিষয়। অপরাপর সামাজিক সংগঠনের মতো সরকারি কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে কেন্দ্র থেকে স্তরভিত্তিক প্রান্তিক প্রশাসনিক ইউনিট বা একক গুলিতে সরকার তার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্নমূখী রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলিরমত বাংলাদেশেও সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিংহভাগই নিজে রাখতে বাধ্য হচ্ছে বিকল্প পূজি এবং ব্যক্তি খাতের আশানুরূপ বিকাশের অভাবে। এই দিক থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১.৩ উপরন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি হলো প্রশাসন। আর এই

---

* প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনের সুষ্ঠ পরিচালনা নির্ভর করে উপযুক্ত এবং দক্ষ কর্মীর উপর, যা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমেই শুধুমাত্র পূরণ সম্ভব। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই 'মূল চালিকা শক্তি' ধারণাটি অধিকতর দ্যোতনা বহন করে, কারণ অস্থিতিশীল রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক মূলবোধের অভাব, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অনুশীলনের ধারাবাহিকতা- হীনতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে প্রশাসনের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২.০ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

কর্মী নিয়োগ কর্মচারী ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারী প্রশাসনে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্ব বহন করে বিরাজিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূলত ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করবো। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ নিয়োগ পদ্ধতি পর্যালোচনা,

২. প্রত্যক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিগত ও পদ্ধতিগত সমস্যাগুলির স্বরূপ নির্ধারণ এবং

৩. এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব প্রণয়ন।

৩.০ তথ্য সংগ্রহ

৩.১ বর্তমান প্রবন্ধ মূলত মাধ্যমিক তথ্য ভিত্তিক। প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহে প্রধানত সরকারের নিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন সার্কুলার, ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রিপোর্ট, বাংলাদেশের নিয়োগ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা ও বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকমিশনের একজন সাবেক সচিবের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। 'প্রার্থী পুল' গঠন করা হয়। ষষ্ঠ স্তরে 'প্রার্থী পুল' থেকে চূড়ান্তনিয়োগ কল্পে বাছাইকরণ করা হয়। সপ্তম স্তরে পূর্ববর্তী সকল নিয়োগ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়।

৪.০ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ ও নির্বাচনঃ পটভূমি ও পদ্ধতি

৪.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা চারটি সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারটি শ্রেণীকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সার্ভিসের এই চারটি শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি অভিন্ন নয়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়, বোর্ড, সংস্থা এই সকল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য

পরিচালনা করে বিভিন্ন নীতি অনুসারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মাঝে নন ক্যাডার বা ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাও আছেন এবং তাদের নিয়োগ পদ্ধতিও ক্যাডার কর্মকর্তাদের থেকে ভিন্ন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মূলত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিই আলোচনা করবো। সিভিল সার্ভিসের এই প্রথম শ্রেণীর পদগুলি কনিষ্ঠ জুনিয়র ব্যবস্থাপকীয় পদ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণী উচ্চ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বর্তমানে ২৯টি ক্যাডার রয়েছে। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ (Ahmed; 1990:160) ১। বি. সি. এস. (প্রশাসন) ২। বি. সি. এস. (খাদ্য) ৩। বি. সি. এস. (সমবায়) ৪। বি. সি. এস. (কৃষি) ৫। বি. সি. এস. (বন) ৬। বি. সি. এস. (মৎস্য) ৭। বি. সি. এস. (গবাদি ও পশুপালন) ৮। বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ৯। বি. সি. এস. (কারিগরী শিক্ষা) ১০। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ অর্থনৈতিক) ১১। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ বাণিজ্য) ১২। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ পরিসংখ্যান) ১৩। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ গণপূর্ত) ১৪। বি. সি. এস. (প্রকৌশল ঃ জন স্বাস্থ্য) ১৫। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ সড়ক ও জনপথ) ১৬। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ টেলিযোগাযোগ) ১৭। বি. সি. এস. (হিসাব ও নিরীক্ষণ) ১৮। বি. সি. এস. (শুল্ক ও আবগারী) ১৯। বি. সি. এস. (কর) ২০। বি. সি. এস. (পররাষ্ট্র) ২১। বি. সি. এস. (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য) ২২। বি. সি. এস. (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাঃ পরিবার পরিকল্পনা) ২৩। বি. সি. এস. (তথ্য) ২৪। বি. সি. এস. (বিচার সংক্রান্ত) ২৫। বি. সি. এস. (ডাক) ২৬। বি. সি. এস. (পুলিশ) ২৭। বি. সি. এস. (আনসার) ২৮। বি. সি. এস. (রেলওয়েঃ পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ২৯। বি. সি. এস. (রেলওয়েঃ কারিগরী)।

৪.৩ ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণীত। এই নীতির ভিত্তিতেই বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ কার্যকর হচ্ছে। কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রধানত তিনটি পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে (বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ ৯)। এগুলি হলো ঃ (ক)সরাসরি নিয়োগ (খ) পদন্নোতির দ্বারা নিয়োগ (গ) বদলী বা প্রেষণে নিয়োগ, এছাড়া (ঘ) এডহক নিয়োগ (ঙ) মৌসুমী নিয়োগ (চ) খন্ডকালীন নিয়োগ (ছ) উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের আত্মীকরণ (জ) ল্যাটারাল এন্ট্রি প্রভৃতি পদ্ধতিতেও উচ্চতর পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়ন নিম্নলিখিত চারভাবে হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ৯) ১। প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারী লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন। ২। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ও

সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে নির্বাচন। ৩। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাছাই পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে নির্বাচন। ৪। শুধু সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচন। যদিও সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রতিটি প্রক্রিয়াই সক্রিয়, কিন্তু প্রবেশ পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রথম প্রক্রিয়াটিই কার্যকর, এবং বলা বাহুল্য এটিই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রধান নিয়োগ প্রক্রিয়া।

৫.০ সরাসরি নিয়োগ

৫.১ সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিতে চার স্তর বিশিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারী টেষ্ট, লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক শর্তাবলে সরকারি কর্ম কমিশন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব হল চাকরি সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের এক্ষেত্রে দায়িত্ব হচ্ছে কর্মকর্তাদের নিয়োগ কল্পে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি। তবে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একাধিক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সক্রিয় থাকে।

চিত্র ঃ বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা

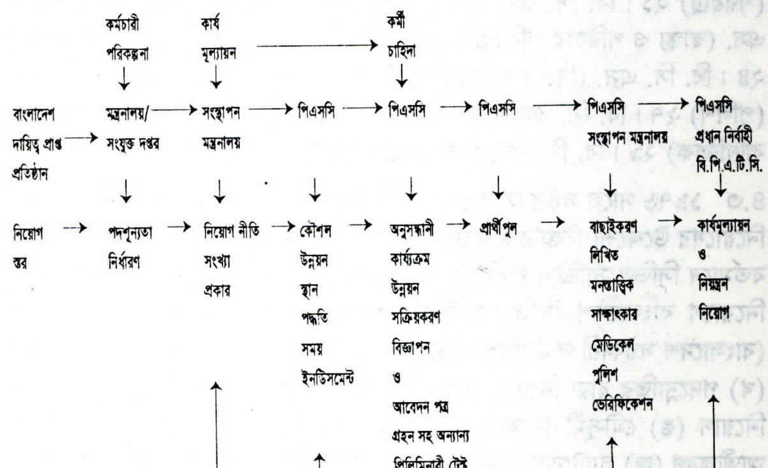

৫.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম স্তরে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর তাদের প্রয়োজনীয় জনশক্তি চাহিদার দাবী সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। সকল মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তর, অধিদপ্তর প্রভৃতির চাহিদা অবহিত হবার পর

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে জনশক্তি চাহিদার সংশোধনীসহ সরকারি কর্মকমিশনে প্রেরণ করে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে শূন্য পদ সম্পর্কে নির্দেশনা পাবার পর কর্মকমিশন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচন পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষার্থীদের অবহিত করে। এ পর্যায়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতি ও প্রাসঙ্গিক কার্য;যেমন মোট শূন্য পদ, ক্যাডার সমূহের নাম, পরীক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষার তারিখ, স্থান, পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র, ফর্ম বিতরণ, ফী গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সরকারী কর্মকমিশনের অধীনে এই নির্বাচনী পরীক্ষা চারটি স্তরে বিশিষ্ট, যথাঃ ১। প্রিলিমিনারী টেষ্ট ২। লিখিত পরীক্ষা ৩। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ৪। মৌখিক পরীক্ষা।

৫.৩ প্রিলিমিনারী টেষ্ট

আবেদনকারী সকল প্রার্থীর মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়ে একটি বাছাই পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০০ নম্বরের মধ্যে এমসিকিউ (MCQ) প্রকৃতির প্রশ্ন পদ্ধতিতে। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত মূল পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। বিসিএস পরীক্ষার পদ অনুপাতে আবেদন কারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৮৯ সাল থেকে এই বাছাই পরীক্ষা প্রচলন করা হয়। এই পরীক্ষায় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সাম্প্রতিক বিশ্ব, বিশ্ব রাজনীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান মূলক প্রশ্ন থাকে। তবে এই পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কোন পাশ নম্বর নেই। সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর থেকে পদ অনুপাতে পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

৫.৪ লিখিত পরীক্ষা

১৯৮৫ সালে অনুমোদিত বিধি অনুসারে বর্তমানে ১০০০ নম্বরের বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে (সরকারী কর্ম কমিশন; ১৯৯৫ঃ ১৯)। প্রিলিমিনারী টেষ্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এ পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের আবশ্যিক ও ৩০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় সহ মোট ৮০০ নম্বর রয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এই পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয়গুলি থেকে ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা।

ক) আবশ্যিক বিষয়গুলির সাধারণ নম্বর বন্টন নিম্নরূপ ঃ (সরকারি কর্ম কমিশন; ১৯৯৪) সাধারণ বাংলা-রচনামূলক ৩০, ভাব সম্প্রসারণ ১৫, ভাব সংক্ষেপ/সারমর্ম ১৫ এবং অশুদ্ধি সংশোধন, শূন্য স্থান পূরণ, বাগধারা-বাগবিধির ব্যবহার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রশ্নের মাল্টিপল চয়েস ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রভৃতি সম্মিলিত ভাবে ৪০ নম্বর, সর্বমোট ১০০।

খ) সাধারণ ইংরেজী-রচনামূলক প্রশ্ন অর্থাৎ Essay-30, Amplification of ideas-15, Substance/Precis writing-15 and Correction of errors in composition, Use of idioms and phrases, Fill in the blanks, Multiple choice and short answers, questions on English language & Literature etc. jointly 40. Total=100

গ) সাধারণ জ্ঞান ঃ ৩০০

এক্ষেত্রে দুটি অংশ; প্রথম, বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী, দ্বিতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে বাংলাদেশের (১) ভূমি ও জনগণ (২) ঐতিহাসিক পটভূমি, (৩) সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি (৪) বাংলাদেশের সংস্কৃতি (৫) শিল্প ও সাহিত্য (৬) বৈদেশিক নীতি (৭) সরকারঃ নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ (৮) সংবিধান (৯) প্রশাসনিক কাঠামো (স্থানীয় সরকার সহ) (১০) প্রজতন্ত্রের সরকারী চাকরি, (১১) বিভিন্ন অর্থনীতি (১২) প্রশাসনিক (১৩) প্রশাসনিক ও ভূমি সংস্কার। সাধারণ জ্ঞানের নম্বর বন্টন নিম্নরূপঃ রচনামূলক-৬০ এবং সংক্ষিপ্ত ও মাল্টিপল চয়েস প্রকৃতির প্রশ্ন- ৪০, মোট ১০০।

ঘ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো; জাতিসংঘ, উত্তর আটলান্টিক চুক্তি ও পশ্চিম ইউরোপীয় নিরাপত্তা বিষয়াবলী, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও আন্দোলনের এজেন্ডা সমূহ, পশ্চিমা উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান কমিউনিটিভুক্ত দেশগুলি, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের পররাষ্ট্র নীতি, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, উত্তর মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির দ্বন্দ্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতা, ও.আই.সি, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়, আন্তর্জাতিক অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্কীত বিষয় আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নম্বর বন্টনঃ বর্ণনাধর্মী রচনামূলক-৬০, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মাল্টিপল প্রশ্ন-৪০ মোট -১০০।

ঙ) সাধারণ গণিত এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞানঃ সাধারণ গণিতের অন্তর্ভুক্ত এসএসসি সমমানের পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি। দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়। উপর্যুক্ত আবশ্যিক বিষয়গুলি ছাড়াও চারটি গ্রুপে বিভক্ত মোট ৬৪টি বিষয় রয়েছে লিখিত পরীক্ষার জন্য, যা থেকে মোট তিনটি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। এখানে নীতিটি হল, এই ৩০০ নম্বরের তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এক গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ দুটি বিষয় নির্বাচন করা যাবে। নিম্নে গ্রুপ ভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নাম উল্লেখ করা হল-(পরিমার্জিত, রহমান; ১৯৯৩ঃ৫৩২-৫৩৪)।

চ) গ্রুপ-১-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ বাংলা, ইংরেজী, আরবী সাহিত্য, পার্সী, সংস্কৃত, পালি, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত, আরবী, দর্শন। গ্রুপ ২-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ ভূগোল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ/সমাজ কর্ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক

প্রশাসন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান। গ্রুপ ৩-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ পদার্থ বিদ্যা, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, গণিত, ভূ-তত্ত্ব, জীব বিজ্ঞান, প্রাণী বিদ্যা, ফার্মেসী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ প্রকৌশল। গ্রুপ ৪-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ হিসাব রক্ষণ, ফাইনান্স/অর্থ বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা প্রশাসন, আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মেডিসিন ও প্যাথলজি, ফিজিওলজি ও এনাটমী, দন্ত বিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল, পশু পালন বিদ্যা, পশু চিকিৎসা বিদ্যা, মৎস্য, সমুদ্র বিজ্ঞান, বন, প্রকৌশল, যন্ত্র প্রকৌশল, রসায়ন প্রকৌশল, মেটালার্জিকাল প্রকৌশল, স্থাপত্য, নৌ-স্থাপত্য ও সুমদ্র প্রকৌশল, টেক্সটাইল টেকনোলজি, লেদার টেকনোলজি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি সর্বমোট৬৪টি ঐচ্ছিক বিষয়।

ছ) লিখিত পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়-বিশেষজ্ঞদের। প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নপত্র কমপক্ষে সাতজন প্রশ্নকারীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। সকল প্রশ্ন থেকে বাছাই করে মূল প্রশ্নপত্রটি তৈরী করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় গড়ে ৪৫% বা তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হন।

৫.৫ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির উপযোগী কৌশলে এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন কমিশনের নিজস্ব মনোবিজ্ঞানীগণ। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার দু'টি ভাগ- লিখিত ও মৌখিক। উভয় ক্ষেত্রে ৫০ করে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর বোধশক্তি, ইচ্ছা, প্রবণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশ ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত গুণাবলী যাচাই করা হয়। এই পরীক্ষায় প্রার্থীকে উত্তীর্ণ হবার জন্য ৪০% ভাগ নম্বর পেতে হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীকে এই পরীক্ষায় আহ্বান করা হয়। মোট ২০০ নম্বরের উপর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই মৌখিক পরীক্ষা পরিচালিত হয় সাক্ষাৎকার বোর্ডের মাধ্যমে। প্রার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোর্ড গঠিত হয় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠিত হয় ৪/৫ জন সদস্য নিয়ে। বোর্ডের প্রধান চেয়ারম্যান, যিনি সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য। একজন সদস্য থাকেন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রতিনিধি বা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত যিনি একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। বিভিন্ন বিষয়-বিশেষজ্ঞ থাকেন একজন এবং একজন থাকেন মনোবিজ্ঞানী। বোর্ড সদস্য এই মনোবিজ্ঞানী কর্ম কমিশনের সদস্যও হতে পারেন আবার কমিশন বহির্ভূতও হতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার নির্ধারিত নম্বর ৪০%। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর বিবেচনায় প্রার্থীকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। মনোবিজ্ঞানীর

বিবেচনায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থী যত নম্বরই মৌখিক পরীক্ষায় লাভ করুন, তিনি পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না। পূর্বোক্ত পরীক্ষা সমূহের পর বি. সি. এস. নিয়োগ বিধি ১৯৮১-এর ৪(৩) (ক) ধারানুযায়ী মেডিকেল বোর্ড গঠন করে প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই করা হয়।

এই সামগ্রিক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর আবেদনকারীর অগ্রাধিকার এবং সরকার নির্ধারিত কোটা বিধি অনুসারে সরকারী কর্মকমিশন প্রার্থীদের ক্যাডার ভিত্তিক মেধা তালিকা প্রস্তুত করে এবং সুপারিশসহ নির্ধারিত প্রার্থীদের তালিকা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। কর্মকমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রার্থী তালিকা পাবার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ, সামাজিক শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলা, আদালত কর্তৃক দন্ড ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়, বিসিএস নিয়োগ বিধি ১৯৮১ এর ৪(৩) ধারায়। সন্তোষজনক পুলিশী রিপোর্ট পাবার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রার্থী তালিকা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাবার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছে নিয়োগপত্র প্রেরণ করে। প্রার্থীদের কর্মে যোগদানের দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিয়োগের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী নিয়োগপত্র দেয়া হয় শিক্ষানবীস হিসেবে। এই শিক্ষানবিসীর মেয়াদ দুই বৎসর। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাডারের জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চার মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়।

৬.০ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের সরাসরি পদ্ধতি তথা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যাগুলিকে আমরা ২টি বৃহৎ দিক থেকে আলোচনা করতে পারি,১। তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও নীতিগত পরিপ্রেক্ষিত এবং পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত।

৬.১ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যাঃ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

নিয়োগ ও নির্বাচনের তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি হলো এখানে দীর্ঘমেয়াদী কোন কর্মচারী পরিকল্পনার অধীনে এই সকল নিয়োগ নির্বাচন সম্পন্ন হয় না। এই নিয়োগের কোন দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য নেই। তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই এই নিয়োগ পদ্ধতি কার্যকর। ফলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় চূড়ান্ত প্রার্থী নিয়োগের সুপারিশের পরও মন্ত্রণালয় থেকে তার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করণের অনুরোধ করা হয় কর্মকমিশনের কাছে। (বাংলাদেশ

সরকারি কর্মকমিশন;১৯৯১ঃ ২৭)। এমন কি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর থেকে শূন্য পদ পূরণের জন্য দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি জারীর পর সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কর্মী নিয়োগ না করারও উদাহরণ রয়েছে (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯১ঃ২৭)। তাত্ত্বিক দিক থেকে নিয়োগ পদ্ধতিতে এটি বড় ধরনের ত্রুটি।

৬.২ সংরক্ষিত পদঃ কোটা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এখানে মেধা ভিত্তিক নিয়োগের পাশাপাশি কোটা ভিত্তিক নিয়োগের উপস্থিতি। অবশ্য কোটা ব্যবস্থায় ও কোটার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা মেধাক্রমানুসারেই নিয়োগের সুযোগ লাভ করে। মোট নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কোটা পদ্ধতি রয়েছে তা পরবর্তী ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.৩ মুক্তিযোদ্ধা কোটা

বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ ক্ষেত্রে প্রচলিত এই পদসংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে ত্রুটি মুক্ত বলে অভিহিত করা যায় না। প্রথমত, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর বয়সসীমায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পদ সংরক্ষণ কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কারণ, এখন কারও বয়স বত্রিশ হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বি.সি.এস পরীক্ষায় কখনোই মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সম্পূর্ণ নিয়োগ দেয়া যায়নি। বিগত ক'বছরে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের অবস্থা দেখানো হলোঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, ১৯৯৫ ঃ ১৭)

সারণী ১ঃ বিভিন্ন সনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা

বিসিএস পরীক্ষার নং	সন	প্রাপ্য পদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুযোগ পাবার % হার	নির্ধারিত কোটার % হার
৭ম	১৯৮৫	৭৫৯	১২২	১৬.১	৩০
৮ম	১৯৮৬	৬৮৬	৩০	৪.৪	৩০
৯ম	১৯৮৮/৮৯	৩৫০	১৩	৩.৭	৩০
১০ম	১৯৮৯/৯০	৩৬০	১	০.০৩	৩০
১১শ	১৯৯০/৯১	৩৭৩	০	০	৩০
১৩শ	৯১-৯২	৪১৫	২	০.৫	৩০
১৪শ	১৯৯২	৫৯১	২	০.৩	৩০
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	৩৩২	০	০	৩০
১৬শ	১৯৯৫	৪১০	১	০.২	৩০

এক্ষেত্রে এর পর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী পাবার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৬.৪ জেলা কোটা

বিসিএস পরীক্ষায় নিয়োগকৃত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মেধা সংকটের আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে জেলা কোটার কারণে। এই জেলা কোটার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্প মেধা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন অধিকতর মেধা সম্পন্ন প্রার্থীর চেয়ে। কারণ, এখানে যেহেতু বিভিন্ন জেলার জন্য নিয়োগ এর নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে, তাই কোন জেলার জন্য নির্দিষ্ট পদ জেলার স্থায়ী অধিবাসী কর্তৃকই শুধু পূরণ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগে জেলা কোটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত রয়েছে। তা নিম্নরূপ (মিয়া; ১৯৯২ঃ১১৭-২২০)ঃ

সারণী ২ঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলার জন্য নির্ধারিত পদ সংখ্যার % হার

জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার
১। ঢাকা	৫.৫৯	১৮। চট্টগ্রাম	৫.২২	৩৫। নবাবগঞ্জ	১.১০	৫২। যশোহর	১.৯৯
২। গাজীপুর	১.৫৫	১৯। কক্সবাজার	১.৩৩	৩৬। নাটোর	১.২৩	৫৩। ঝিনাইহদাহ	১.২৭
৩। মানিকগঞ্জ	১.১০	২০। বান্দরবন	০.২২	৩৭। দিনাজপুর	২.০৮	৫৪। মাগুড়া	০.৬৮
৪। মুন্সিগঞ্জ	১.১১	২১। খাগড়াছড়ি	০.৩৩	৩৮। ঠাকুরগাঁও	০.৯৩	৫৫। নড়াইল	০.৬২
৫। নারায়নগঞ্জ	১.৬৬	২২। রাঙ্গামাটি	০.৩৮	৩৯। পঞ্চগড়	০.৬৭	৫৬। কুষ্টিয়া	১.৪০
৬। নরসিংদী	১.৫৬	২৩। কুমিল্লা	৩.৮৭	৪০। রংপুর	২.০১	৫৭। চুয়াডাঙ্গা	০.৭৫
৭। ফরিদপুর	১.৪১	২৪। ব্রাহ্মনবাড়িয়া	২.০৫	৪১। নীলফামারী	১.২৮	৫৮। মেহেরপুর	০.৪৬
৮। রাজবাড়ী	০.৯৮	২৫। চাঁদপুর	১.৯৫	৪২। কুড়িগ্রাম	১.৪৮	৫৯। বরিশাল	২.০৯
৯। গোপালগঞ্জ	০.০১	২৬। নোয়াখালী	২.১৪	৪৩। গাইবান্ধা	১.৭৭	৬০। ভোলা	১.৩৬
১০। মাদারীপুর	১.০১	২৭। ফেনী	১.০৫	৪৪। লালমনিরহাট	০.৮৮	৬১। ঝালকাঠি	০.৬৩
১১। শরিয়তপুর	০.৯০	২৮। লক্ষীপুর	১.২৬	৪৫। বগুড়া	২.৪৫	৬২। পিরোজপুর	১.০০
১২। জামালপুর	১.৭৬	২৯। সিলেট	২.০৭	৪৬। জয়পুরহাট	০.৭০	৬৩ পটুয়াখালী	১.১৮
১৩। শেরপুর	১.০৫	৩০। হবিগঞ্জ	১.৪২	৪৭। পাবনা	১.৭৮	৬৪। বরগুনা	০.৭২
১৪। ময়মনসিংহ	৩.৬৫	৩১। মৌলবীবাজার	১.৩২	৪৮। সিরাজগঞ্জ	২.১৪		
১৫। কিশোরগঞ্জ	২.০৭	৩২। সুনামগঞ্জ	১.৬১	৪৯। খুলনা	১.৯৪		
১৬। নেত্রকোনা	১.৫৯	৩৩। রাজশাহী	১.৮১	৫০। সাতক্ষীরা	১.৫১		
১৭। টাংগাইল	২.৭৭	৩৪। নওগাঁ	১.৯৬	৫১। বাগেরহাট	১.৩৪		

এই কোটা ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলাগুলির প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বঞ্চিত হচ্ছেন তুলনামূলকভাবে অধিক মেধা সম্পন্ন হবার পরও। ১৯৯৩-৯৪ সালে অনুষ্ঠিত ১৫শ বি. সি. এস পরীক্ষার বিভিন্ন ক্যাডারের নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের ফলাফল দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৪)

সারণী ৩ঃ সাধারণ ক্যাডারে মেধা ও জেলা কোটা ভিত্তিক পদ প্রাপ্তির তুলনামূলক বিবরণ

ক্যাডার	মেধা কোটায় পদের সংখ্যা	মেধা কোটায় প্রাপ্ত সর্ব নিম্ন মেধাক্রম	জেলা কোটায় পদের সংখ্যা	জেলা কোটায় প্রাপ্ত সর্ব নিম্ন মেধাক্রম
পররাষ্ট্র	৭	৭	৯	১৭৫
প্রশাসন	৫৬	১২০	৬৯	৩০৬৬
কর	১৪	১৭৯	১৬	২২৬১
হিসাব ও নীরিক্ষা	১০	১৯৪	১২	৩০৪০
শুল্ক ও আবগারী	৭	৩৯	৮	৬২১
তথ্য (সাধারণ)	৬	১৫৫	৮	৩১১৭
ডাক	১৩	২৫৩	১৬	৪১৮
পুলিশ	৩৪	১৮৩	৪১	১৬৪০
সমবায়	৩	২৫৯	৩	৪১১
আনসার	৮	২৮৪	১০	৩২০৫
খাদ্য (সাধারণ)	১	২২১	২	২৪১

একই সময় অর্থাৎ ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৫শ বি.সি.এস পরীক্ষায় টেকনিক্যাল ক্যাডারে মেধা ও জেলা কোটা ভিত্তিক পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বিষয়টি দেখা যায় একই রকম অর্থাৎ জেলা কোটার সুযোগে সকল ক্যাডারেই তুলনামূলকভাবে অনেক নিম্ন মেধার প্রার্থী নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন সহজেই। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫: ১৬)।

সারণী ৪ঃ টেকনিক্যাল ক্যাডারে ১৫শ বিসিএস পরীক্ষায় মেধা ও জেলা কোটায় নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের তুলনামূলক বিবরণ

ক্যাডার	মেধা কোটায় পদের সংখ্যা	মেধা কোটায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মেধাক্রম	জেলা কোটায় পদের সংখ্যা	জেলা কোটায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মেধাক্রম
স্বাস্থ্য	১৩২	১২৯	১৬১	৯৬০
তথ্য (কারিগরী)	২০	৫৯	২৪	২৪৩
খাদ্য (কারিগরী)	৪	২৮	৫	১৩৭
গনপূর্ত (সিভিল)	৯	৪১	১১	২০০
গণপূর্ত (তড়িৎ)	৪	৩৬	৫	৮৪
গণপূর্ত (যান্ত্রিক)	১	৫	১	১৮
কৃষি (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	৫	৩০	৫	৪৯
কৃষি (বিষয়বস্তু কর্মকর্তা)	৭	২১	৮	৩৪৪
অর্থনীতি (কৃষি)	৩	১৫	৪	৮৩
অর্থনীতি (অর্থনীতি)	১১	৩৯	১৪	১৬৪
অর্থনীতি (পরিসংখ্যান)	৫	৩৫	৫	২৬৮

৬.৫ উপজাতীয় কোটা

সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়েগের নীতিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ত্রুটি হলো উপজাতীয় কোটা। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত কোটায় তেমন কোন প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের খুব অল্প সংখ্যক জেলাতে স্বল্প সংখ্যক উপজাতীয়দের বাস। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না ঘটলে তাদের জন্য শুধুমাত্র পদ সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করে কোন সুফল আশা করা যায় না। নীচের সারণীতে বিগত কয়েকটি বি.সি.এস পরীক্ষার উপজাতীয় কোটায় নিয়োগ প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের বিবরণ দেওয়া হলো- (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৭)

সারণী ৫ঃ বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় উপজাতীয় কোটায় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের বিবরণ

বিসিএস পরীক্ষা	সন	উপজাতীয় কোটায় প্রাপ্য পদ সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের % (প্রাপ্য পদের তুলনায়)
৭ম	১৯৮৫	১২৭	৫	৩.৯
৮ম	১৯৮৬	১০৬	১০	৯.৪
৯ম	১৯৮৮-৮৯	৫৯	৬	১০.২
১০ম	১৯৮৯-৯০	৫৭	১	১.৮
১১শ	১৯৯০-৯১	৫৩	-	-
১৩শ	১৯৯১-৯২	৬৮	১	১.৫
১৪শ	১৯৯২	৯৯	-	-
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	৫৩	৬	১১.৩
১৬শ	১৯৯৪	৬৮	১	১.৫

৬.৬ মহিলা কোটা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগে বর্তমান 'মহিলা কোটা' একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির কারণেই সিভিল সার্ভিসে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির নীতিগত উদ্দেশ্যটি পূরণ হতে পারছেনা। কারণ সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য কোটায় পদ সংরক্ষণের ধারণা, যেমন জেলা কোটা বা উপজাতীয় কোটা ইত্যাদি অনগ্রসর শ্রেণীকে সুযোগ দানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মহিলা কোটা এর ব্যতিক্রম। কারণ মহিলারা পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনগ্রসর হলেও বি.সি.এস পরীক্ষায় যে অর্থে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন, তাতে তারা সমাজের অবহেলিত মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কারণ বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর

সামন্তবাদী অর্থনীতি ভিত্তিক একটি দেশে যে সকল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছেন তারা তুলনামূলক ভাবে উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নিঃসন্দেহে। তাই একই যোগ্যতা একই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ একই বিষয় অধ্যয়নের পর, এমনকি আবেদনের ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা নির্ধারণের পরও মহিলা কোটা পৃথকভাবে সংরক্ষণের পেছনে যুক্তি খুব স্বচ্ছ হতে পারে না। বলা যায় সামাজিক একটি এলিট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাই শুধু এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। কারণ, আর্থ-সামাজিক নানা কারণেই গ্রামীণ পটভূমির একজন নারীর পক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারি চাকরি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিগত ক'বছরের বি.সি.এস পরীক্ষার নিয়োগ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমান মহিলা কোটার মাধ্যমে মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। (সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৭০)

সারণী৬ঃ বিভিন্ন সালে বি.সি.এস পরীক্ষার মহিলা কোটায় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের তুলনামূলক বিবরণ

বিসিএস পরীক্ষা	সাল	প্রাপ্য পদ সংখ্যা	প্রাপ্ত পদ সংখ্যা	প্রাপ্য পদের ও প্রাপ্তদের তুলনামূলক % হার	মহিলাদের বিশেষ কোটা ছাড়া মেধা ও জেলা কোটায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা (মোট পদের %)
৭ম	১৯৮৫	২৫৩	২৫৩	১০০	৯৭ (৪.৫%)
৮ম	১৯৮৬	২১২	২১২	১০০	৯৬ (৪.৫%)
৯ম	১৯৮৮/৮৯	১০৭	৮৩	৭০.৯	১০৬ (৯.০%)
১০ম	৮৯/৯০	১১৯	৪৬	৩৮.৭	৭১ (৭.০%)
১১শ	৯০/৯১	১১৯	৪৪	৩৭.০	৬০ (৮.৬%)
১৩শ	৯১/৯২	১৪১	৬২	৪৪.০	৯৮ ৯৮.৪%)
১৪শ (বিশেষ)	১৯৯২	১৯৭	১২৬	৬৪.০	৪০৩ (২১.৪%)
১৫শ	১৯৯৩	১১৪	৬৭	৫৯.০	৯৬ (১১.২%)
১৬শ (বিশেষ)	১৯৯৪	১৩৭	১১২	৮১.৮	২৯৫ (২১.৯%)

পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে সার্বিকভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মহিলাদের মেধাগত নৈপূণ্য সন্তোষজনক নয়। কিন্তু তবুও মহিলা কোটায় পদ সংরক্ষণের কারণে মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশী পদ পেয়ে যাচ্ছেন। এটি যৌক্তিক নিয়োগ নীতির পরিপন্থী। সামগ্রিক বিচারে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে এই কোটা ব্যবস্থা একটি মেধা সংকট সৃষ্টি করছে যাকে ক্যাডার সার্ভিসের গুণগত মানহ্রাসের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া এই কোটা পদ্ধতি নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি অসাম্যের সৃষ্টি করেছে যা বাংলাদেশের সাংবিধানিক নীতিমালারও পরিপন্থি। বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ভাষ্য হল "রাষ্ট্রের কর্ম নিয়োগ ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-নারী: পুরুষ-জাতি-উপজাতি সবার সমান সুযোগ থাকবে--"

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪: ২৯)। যদিও "রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই সুযোগ সংরক্ষণের অধিকারও রাখবে" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪: ২৯ (২) (গ)। অথবা "প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবে" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪; ১৩৩ ধারা) বলে সাংবিধানিক ভাবেই বর্ণিত তবুও মেধা ও কোটা ভিত্তিক নিয়োগের মধ্যে যোগ্যতার বিশাল পার্থক্য এক্ষেত্রে একটি অসাম্য, একটি অবিচার, একটি অন্যায় প্রবণতাই আমাদের সামনে যেন প্রকাশ করে।

৬.৭ টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদপ্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে যোগদান প্রবণতা নীতিগত প্রেক্ষিত থেকে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে আরেকটি গুরুতর ত্রুটি হচ্ছে, টেকনিক্যাল বা কারিগরী শিক্ষায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নন-টেকনিক্যাল বা সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত হবার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। "বর্তমান বি.সি.এস পরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী সকল ক্যাডারে একই সাথে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে কিছু সংখ্যক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের শূন্য পদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দান সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ঐ সকল ক্যাডারের প্রার্থীগণ সাধারণ ক্যাডারের পদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে পছন্দক্রম দিয়ে থাকেন এবং তাদের নিজস্ব ক্যাডার অর্থাৎ টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য পছন্দক্রম দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। বা দিলেও তা সাধারণ ক্যাডারের নীচে দিয়ে থাকেন।" (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:২৫)। বিগত কতগুলি বিসিএস পরীক্ষার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবেঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:২৬০।

সারণী ৭ঃ বিভিন্ন সালের বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত কারিগরী ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের % হার।

বিসিএস পরীক্ষা	সন	সাধারন ক্যাডারে টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল প্রার্থীদের নিয়োগের % হার (টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদে নির্বাচিত মোট প্রার্থীর তুলনায়)
৮ম	১৯৮৬	৫.১২
৯ম	১৯৮৮	৯.০৫
১০ম	১৯৮৯	৯.২৫
১১শ	১৯৯০	১৪.৭০
১৩শ	১৯৯১	১৫.১১
১৫শ	১৯৯৩	১৭.০০

সারণীর পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে যে টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে যোগদান প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সত্যিকার

নিয়োগ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। যে কোন নিয়োগ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ও তাদের যথাযথ কর্মে নিয়োগ। কিন্তু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি বিপরীত প্রবণতা প্রকাশ্য হওয়া সত্ত্বেও এখনো এ প্রবণতা রোধের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নীতিগত প্রেক্ষিত থেকে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ত্রুটি।

৬.৮ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারণে অষ্পষ্টতা: সিভিল সার্ভিসের সাধারণ ক্যাডার পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক/সম্মান বা তদূর্ধ্ব গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী প্রয়োজন। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোর গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের নম্বর পদ্ধতিতে শ্রেণী নির্ধারণ করা সহজ। কিন্তু টেকনিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী নির্ধারণে অনেক সময়ই জটিলতা দেখা দেয়। কারণ এসব পরীক্ষায় কৃতিত্ব নির্ধারণ করা হয় গ্রেডিং এর মাধ্যমে। যেমন ১৯৯০/৯১ সালের বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ প্রাপ্ত ৫জন চিকিৎসক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের সাথে তুলনা করলে তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের। টেকনিক্যাল প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে আবেদনের যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়ে কোন সুস্পস্ট নীতি না থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটি যৌক্তিক নিয়োগ নীতির পরিপন্থি।

৭.০ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যাগুলি নিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। এই সমস্যাগুলির উপস্থিতি সামগ্রিক নিয়োগ পদ্ধতির অকার্যকারিতার জন্যও অনেকাংশে দায়ী। পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে যে সমস্যাগুলি মূল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

৭.১ প্রিলিমিনারী টেষ্ট

এখানে বিসিএস পরীক্ষার প্রথম স্তরেই সকল আবেদনকারীর মধ্য থেকে সীমিত সংখ্যক পরীক্ষার্থী বাছাই কল্পে 'মাল্টিপল চয়েস' পদ্ধতিতে সাধারণ জ্ঞান ধর্মী প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রিলিমিনারী টেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে মূল অসুবিধা হলো এ ধাঁচের পরীক্ষার সাথে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের কোন পরিচয় নেই, না প্রকৃতিগত দিক থেকে, না পদ্ধতিগত দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এই ধাঁচের পরীক্ষা বা সিলেবাসোপযোগী অধ্যয়নের সুযোগ নেই। ফলে নিজস্ব বিষয়ে কৃতী অনেক ছাত্র বা ছাত্রীও এই পরীক্ষায় মেধা প্রদর্শনে অসুবিধার সম্মুখীন এমনকি অকৃতকার্যও হতে পারে। যে ধাঁচের প্রশ্ন বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুশীলন করানো হয় না, তার ভিত্তিতে বি.সি.এস

পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় পরীক্ষার কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা নির্ধারণ সাধারণ ভাবেই প্রশ্নাতীত হতে পারে না।

৭.২ মূল লিখিত পরীক্ষা

এখানে বি.সি.এস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন খুবই বর্ণনাধর্মী। উত্তরও আশা করা হয় তেমনি। এক্ষেত্রে তাই প্রার্থীর ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, বিষয় সম্পর্কে ধারণার স্বচ্ছতা ইত্যাদি যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই। অথচ উন্নয়ন প্রশাসক হিসেবে এই ক্যাডার কর্মকর্তাদের যে ভূমিকা সেখানে বিশ্লেষণ ক্ষমতার তীক্ষ্ণতা, অসাধারণ সৃজনশীলতা, নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণার পূর্ণ স্বচ্ছতা ইত্যাদি চূড়ান্তভাবে আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো আটশত নম্বরের পরীক্ষার বিশাল আয়োজন দিয়েও আমাদের দেশে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতিতে সেটা নিশ্চিত করা সহজ নয়।

৭.৩ বিসিএস পরীক্ষার আবেদন ফর্ম সংক্রান্ত সমস্যা

বি. সি. এস পরীক্ষার আবেদনের ফর্ম অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম আবেদনকারীদের পূরণ করতে হয়। যার একটি পূরণ করার জন্য বিশেষ ধরনের পেন্সিল ব্যবহার করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই এই ফর্মের জটিল কাঠামোর জন্য এটা পূরণে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া এই ফর্মে সকল আবেদনকৃত প্রার্থীর সম্পর্কে সমাজে দু'জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মতামত চাওয়া হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই দু'জন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে তথ্যের সত্যতা যাচাই সম্ভব নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এই মতামত সংগ্রহ একটি দুর্নীতির সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে পারে; মন্তব্যকারী, মন্তব্য প্রার্থী উভয় দিক থেকেই।

৭.৪ লিখিত পরীক্ষার বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা

যে কোন নিয়োগের একটি মৌলনীতি হলো নিয়োগ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর মেধা যাচাই প্রক্রিয়া প্রার্থীর পদের সাথে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ দিক থেকে বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগের যাচাই পরীক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রুটি ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পরীক্ষার আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রে চারটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এবং আবেদনকারী প্রার্থীগণ চারটি গ্রুপের বিষয় থেকে যে কোন তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। এক্ষেত্রে একমাত্র নির্দেশনা হলো কোন গ্রুপ থেকে দু'টির বেশী বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া যাবেনা। এর ফলে দেখা যায় প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিজের অধীত বিষয় না নিয়ে অধিক নম্বর তোলার জন্য সম্মান শ্রেণীর অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে বা দিতে বাধ্য হচ্ছে। বিগত

বি.সি.এস পরীক্ষাগুলির প্রার্থীদের শিক্ষাগত পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায়। এই পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল কলেজগুলির সম্মানসহ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীর সংখ্যাই বেশী। নীচের সারণীতে বিগত তিনটি বিসিএস পরীক্ষার সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি বিবরণ দেয়া হলো ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ৬৭-৬৮)।

সারণী ৮ঃ বিগত কয়েকটি বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ সুপারিশ প্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষাগত পটভূমি

বিসিএস পরীক্ষা	সন	স্নাতক	স্নাতক সম্মান	স্নাতক চিকিৎসা	স্নাতক প্রকৌশলী	সর্বমোট
১১শ	১৯৯০-৯১	১০.১%	৮১.২%	২.৮%	৬.৩%	১০০
১৩শ	১৯৯১-৯২	৮.৩%	৮৫.৯%	১.৬%	৪.৩%	১০০
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	২০.১%	৭৫.৪%	১.১%	৪.৫%	১০০

সারণীতে দেখা যাচ্ছে তিনটি বি.সি.এস পরীক্ষাতেই স্নাতক সম্মান পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে যেহেতু বিষয়ের ক্ষেত্রে স্পেশিয়ালাইজেশন হয়, তাই এখানে সম্মান বিষয় সম্পর্কিত কোর্সই প্রধান থাকে এবং প্রাধান্য পায়। কিন্তু সম্মান শ্রেণীর অধীত কোর্সগুলি পরীক্ষার জন্য পিএসসি কর্তৃক নির্বাচন না করাতে আবেদনকারীরা বাধ্য হচ্ছেন অন্য কোর্স নিতে। এতে সত্যিকার মেধা যাচাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নিয়োগ পদ্ধতির একটি মৌল নীতি হল কার্যের সাথে প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট পদের বা সার্ভিসের লক্ষ্যে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইকরণ। নিয়োগের এই মৌল নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এস.এস.সি সমমানের ষ্টান্ডার্ডে বাধ্যতামূলক ভাবে গণিত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের যৌক্তিকতা খুঁজে যাওয়া যায় না।

৭.৫ ক্যাডার সিলেকশনে প্রার্থীর প্রাধান্য

নিয়োগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি মৌল বিষয় হলো বিভিন্নধর্মী বহুবিধ প্রক্রিয়াতে কর্মীর সক্ষমতা যাচাই বাছাই-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ। কিন্তু বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নিয়োগ এক্ষেত্রে স্বয়ং প্রার্থীদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মনোভাবই মূলত প্রাধান্য পায়। যার কারণে বি.সি.এস পরীক্ষার মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেও সাধারণভাবে আবেদনকারীদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পছন্দের ক্যাডারে যাবার উদাহরণও আছে। এছাড়া যে ক্যাডারের নাম মূল আবেনদপত্রে প্রার্থী উল্লেখ করবেন না, সে ক্যাডারের জন্য প্রার্থীকে বিবেচনা করা হয় না। এর ফলে প্রার্থী উল্লিখিত ক্যাডারে সুযোগ না পেলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সন্তোষজনক দক্ষতা প্রদর্শন করার পরও নিয়োগ না পাবার সম্ভাবনা থাকে।

এটি নিয়োগের পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি গুরুতর ত্রুটি। কারণ, বিভিন্ন স্তর পার হয়ে একজন প্রার্থী সাক্ষাৎকার পর্বের জন্য নির্বাচিত হন এবং একটি বিশেষজ্ঞ বোর্ড তার উপযুক্ততা নির্ধারণ করে প্রার্থীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে একজন প্রার্থী কোন্ ক্যাডারের জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণে বোর্ডের ভূমিকা থাকা উচিৎ এবং সেটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ একজন প্রার্থীর ক্যাডার পছন্দের আবেগ, উচ্চাশার বিপরীতে বোর্ডের বিবেচনাবোধ ও যৌক্তিকতার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। তাতে সুষ্ঠু মেধা বন্টনের অধিক সুযোগও সৃষ্টি হবে।

৭.৬ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

যে কোন নিয়োগ পদ্ধতিতেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ নিয়োগের এই স্তরেই প্রার্থীর ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব। মেধার পাশাপাশি এ সকল গুণাবলী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততা, নেতৃত্বগুণ, উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুণাবলী পরিমাপ করা যায়। কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন পরিপ্রেক্ষিত থেকে এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মেধা তালিকা প্রণয়নে এ সকল গুণাবলীর মূল্যায়ন হওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু ক্যাডার কর্তকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে এখানে এই পরীক্ষা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি এমনকি প্রার্থীর সামগ্রিক মেধা স্থান নির্ণয়ে এই পরীক্ষার নম্বরও অন্যান্য পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হয় না। নিয়োগের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত থেকে এটি একটি গুরুতর ত্রুটি।

৮.০ সুপারিশ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর করার জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হল ঃ

নীতিগত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত সুপারিশ

ক) মুক্তিযোদ্ধা কোটা ঃ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে কোটা বা পদ সংরক্ষণ নীতি পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অবলুপ্ত করা প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত পদগুলি মেধা কোটা এবং অন্যান্য কোটার সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

খ) উপজাতীয় কোটা ঃ উপজাতীয় কোটাটিকে বহাল রাখা হলেও যে ক্ষেত্রে এই কোটায় সম্পূর্ণ পদ পূরণ করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্তি পদগুলি মেধা কোটার সাথে একীভূত করার পক্ষে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

গ) মহিলা কোটা ঃ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগে মহিলা কোটার বর্তমান পদ্ধতিটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিগত ক'টি বি.সি.এস পরীক্ষার পরসিংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মহিলা কোটায় পদ সংরক্ষিত রাখা হলেও

প্রাপ্তপদ পূরণ করা যায়নি, তাই মহিলা নিয়োগের হার আশানুরূপ রাখতে মহিলাদের ক্ষেত্রে বরং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মানদন্ড পূনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন মহিলা প্রার্থীদের বয়সের সীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে, ইত্যাদি।

ঘ) জেলা কোটা ঃ বর্তমান জেলা কোটা সম্পর্কিত নীতিও পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ নিয়োগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে মেধার পৃষ্ঠপোষকতা করাও জরুরী। মেধা ভিত্তিক নিয়োগের হার ৪৫% ভাগ থেকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ঙ) টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রাপ্ত যে সকল প্রার্থী সাধারণ ক্যাডারে যোগদানে ইচ্ছুক তাদের পরীক্ষা পাশের মানদন্ড সাধারণ ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের সমমানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাধারণ ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের পরীক্ষায় আবেদনের জন্য স্থিরকৃত মানের চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন টেকনিক্যাল ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থী যেন সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ না পেতে পারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৮.২ বি.সি.এস পরীক্ষার পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত সংক্রান্ত সুপারিশ

ক) প্রিলিমিনারী টেষ্ট ঃ বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারী টেষ্টের পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাধারণজ্ঞান মূলক এম. সি. কিউ পদ্ধতির পরিবর্তে আবেদনকারী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত ঐচ্ছিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। এই পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে এবং প্রতিটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। ২০থেকে ২৫টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য বর্তমান প্রিলিমিনারী পরীক্ষার মতই এক ঘন্টা সময় নির্ধারিত থাকবে। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মূল পরীক্ষার সাথে যোগ হবে। ফলে মেধা বিচারের মানদন্ড অধিকতর সুষ্ঠু হবে এবং প্রার্থীদের নির্বাচন পদ্ধতি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে।

খ) প্রার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি রয়েছে তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক সম্মান এবং মাষ্টার্স শ্রেণীর অধীত কোর্সগুলিও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। অন্যান্য টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও তাদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধীত কোর্সগুলির মধ্য থেকেই যেন ঐচ্ছিক বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করা যায়, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রার্থীর স্নাতক, সম্মান বা মাষ্টার্স ডিগ্রীর অন্তর্ভুক্ত কোর্সগুলি থেকেই যেন ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নির্বাচন করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মন্তব্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য " The written papers should offer a wide choice of subjects of all disciplines that are being taught in our universities

and abroad...there should be a few compulsory papers..." (Report of the Pay of Services Commission; 1977 : 206)

গ) ক্যাডার নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি প্রার্থীর ব্যক্তিগত পছন্দের প্রাধান্যের ভিত্তিতে না হয়ে লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকমিশন কর্তৃক নির্বাচিত বোর্ডের সিদ্ধান্ত ভিত্তিক হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর মূল মেধাক্রম নির্ধারণের সময় অবশ্যই যোগ করা প্রয়োজন।

৯.০ উপসংহার

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব প্রভৃতির গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, ব্যক্তিখাতের আশানুরূপ বিকাশের অভাব এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে উত্থিত কারণে এখানে উন্নয়নে সরকারই প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ লোক প্রশাসন। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ-নির্বাচন স্বতন্ত্র গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও নানা ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে। "... it is extremely important to formulate a clearly defined recruitment policy for the public services, taking into consideration the vital issues of implementing the goals of equal employment opportunity, as well as securing the sociological and geographical representation of nation's population." (Khan & Zafarullah; 1984:11) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপক খান এবং জাফরুল্লাহ এ মন্তব্য করেছিলেন প্রায় একযুগ আগে। কিন্তু নীতিগত ক্ষেত্রে নানা সংস্কার, পরিবর্তন সংযোজন ও বিয়োজনের পরও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতিতে এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। দেশে দক্ষ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সরকারের উচ্চতর নিয়োগ ও নির্বাচন ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশ

বাংলা

১। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* ১৯৯৪, ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী ছাপাখানা।

২। মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ ১৯৯৪, *চাকরীর বিধানাবলী,* ঢাকা, রোদ্দুর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

৩। রহমান, এম, শামসুর ১৯৯৪, আধুনিক লোক প্রশাসন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম পূর্ণমুদ্রণ।

৪। সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ১৯৮১, *বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১,* বাংলাদেশ সরকার।

৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, *নোটিফিকেশন* নং এমই আর/এর/-১/এস-১৩/৮৪-১৪৯ (২০০) তাং ২৮/৭/১৯৮৫।

৬। সরকারী কর্মকমিশন, ১৯৯১, *বার্ষিক প্রতিবেদন।*

৭। সরকারী কর্মকমিশন, ১৯৯৫, *বার্ষিক প্রতিবেদন।*

ইংরেজী

1. Ahmed Syed Giasuddin (1990). *Bangladesh Public Service Commission.* Dhaka. The Universiy of Dhaka. Bangladesh.
2. Cabinet Division (1977). *Report of the Pay & Services Commission (PSC), GOB, VOI-1, ChaphX.*
3. Decenzo. David A & Robbins. S. P (1993). *Personnel Human Resource management.* Prentice-Hall of India Ltd. New Delli. 3rd ed.
4. Flippo. Edwin B (1976). *Principles of Personnel Management,* Mc Graw-Hill Book Company. New Yourk. USA. 4th ed.
5. Hawk. Roger H (1967). *The Recruitment Function, American Management Association,* New York. (Collected from Decenzo; opcit;).
6. Heneman & Dyer (1980). *Personnel: Human Resource Management* Rechard D IRWIN. inc. Homewood. Illinois. USA.
7. Khan. M. M & Zafarullah. H. M (1984). *Recruitment & Selection In the Higher civil Services of Bangladesh: An Overview,* SICA oocational paper series. No-6. University of Texas. USA.
8. Ministry of Establishment (1982). *Bangladesh Civil Service (Age, Qualification & Examination for Direct Recruitment) rules, GOB.*
9. Public Service Commission Secretariat. *Detailed Syllabus For BCS Examination,* (REvised upto-1994). Bangladesh Government Press. Dhaka.
10. World Bank (1996). *Bangladesh Government That works-Reforming the Public Sector, Draft Report No-15182 BD. Private Sector Development & Finance Division,* Country Department 1-South Asia region.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণঃ বাংলাদেশ চর্চা প্রসঙ্গ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম *

১.০ ভূমিকা

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়। কেন, কিভাবে এবং কোন দর্শনের উপর ভিত্তি করে এ প্রশিক্ষণের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো।

২.০ সিভিল সার্ভিসে প্রশিক্ষণ

২.১ বৃটিশ আমল

১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী ক্ষমতা লাভ করার ফলে তাদের কর্মপরিধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক দায়িত্ব ছাড়াও তাদের উপর কর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায়। কর সংগ্রহে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও গঠন করতে হয়। কর সংগ্রহে প্রয়োজনবোধে এ বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হত। ফলে কর ব্যবস্থাপনার সাথে আইন শৃংখলা সংরক্ষণ কার্যক্রমও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়। এভাবে কর্মপরিধির ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার পূণর্বিন্যাসের প্রয়োজন পড়ে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হোস্টিংস কোম্পানী প্রশাসনকে পূণর্বিন্যস্ত করেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি কোম্পানী প্রশাসনকে ১। বাণিজ্যিক; এবং ২। সাধারণ প্রশাসনে বিভক্ত করেন। এ মর্মে গ্লাডেন উল্লেখ করেন "He (Warren Hastings) reorganised the revenue administration, remodelled the judicial system and freed trade from its existing abuses"[১]। পরবর্তী পর্যায়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব প্রশাসনকে ঢেলে সাজান এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর ফলে প্রশাসনকে আরো সুসংহত করার প্রয়োজন পড়ে। ও'মালের

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মতে কোম্পানী প্রশাসনের অবকাঠামো নির্মাণে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিশ দু'জনেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি বলেন"The former laid the foundations on which the latter built up a superstructure"[২]।

কোম্পানী কর্মচারীদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও সাধারণ প্রশাসন, বিশেষ করে কর ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার এ ঘাটতি পূরণে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৮০০ সালে কোলকাতায় "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে উক্ত কলেজের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হলো :

...to provide liberal as well as specialized education and training for the recruits to the covenanted civil service. The syllabus comprised the humanities, sciences and some of the native languages"[৩].

রাইটারদের প্রাশিক্ষণের জন্য ১৮০৬ সালে ইংল্যান্ডের হেইলেবারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য উক্ত কলেজে দু'বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। পাঠসূচীতে European classical languages, mathematics, laws, political economy, general history and oriental language[৪] অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১৮৫৩ সালের Govenment of India Act, এ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং নিয়োগোত্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই আইনের সুত্র ধরে লর্ড ম্যাকলেকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১৮৫৪ সালে প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে সিভিল সার্ভেন্টদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিবর্তে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁরা মনে করতেন সাধারণ ব্যবস্থাপনার জন্য সিভিল সার্ভেন্টদের "High power of mind"[৫]থাকা প্রয়োজন এবং এ মানসিক যোগ্যতা অর্জন "The best, the most liberal and the most finished education"[৬] দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। সে জন্যে তাঁরা সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক (তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ বৃটেনে এবং প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ ভারতবর্ষে) উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর মধ্যে "history, jurisprudence, commercial and financial science, and oriental languages"[৭] অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ দর্শন ও কার্যক্রম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হতে থাকে। ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ভারতের অনুরূপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফ্রান্সের "ENA" (Ecola National Administration),

জার্মানীর "The Academy for Public Administration এবং The Civil Service College এবং স্পেনের Civil Service Training Centre"[৮] অন্যতম।

২.২ পকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে লাহোরে সিভিল সার্ভিসের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য সিভিল সার্ভিস একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ আমলের (লর্ড ম্যাকলের মতাদর্শ "High Power of Mind") প্রশিক্ষণ দর্শনের ভিত্তিতে পাঠক্রম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা হত। উক্ত একাডেমীর পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন (যেমনঃ দেওয়ানী আইন, ফৌজদারী আইন, সাক্ষ্য আইন, ভূমি আইন ইত্যাদি), ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামিক ষ্টাডিজসহ অন্যান্য পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৎকালে পাকিস্তান সরকারের প্রবঞ্চনার ফলে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার প্রায় ১৪ বছর পর নিম্নলিখিত তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় (সারণী-১)ঃ [৯]

সারণী-১ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থাপনের সাল	অংশগ্রহনকারীর পর্যায়
ক. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন(NIPA)	**১৯৬১**	**মধ্যসোপানের কর্মকর্তা**
খ. গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (GOTA)	১৯৬১	নবনিযুক্ত সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ
গ. স্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (STI)	১৯৬৩	কর্মচারীবৃন্দ

Source : Ali Ahmed, Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants (Dhaka ; BASC, 1984) pp. 191-224.

২.৩ বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের ফলে পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উপর্যুক্ত তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (সারণী-১) লাভ করে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জন্য লাগসই মনমানসিকতা সম্পন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী গঠনে প্রশিক্ষণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) উন্নয়ন ও

প্রশাসনে জড়িত সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'গোটা'কে পূর্ণবিন্যস্ত করে কোটা' (সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী) সৃষ্টি করা হয় এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের (যুগ্ম-সচিব ও সমপর্যায়) প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (BASC)প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশের লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) মূলত উপর্যুক্ত চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত রূপ। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং XXVI, ১৯৮৪) বলে বিপিএটিসি জন্মলাভ করে।

১৯৭৯ সালে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং পাঠক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি কমিটি তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (STI ব্যতিরেকে) কে একই ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। সাধারণ সুবিধাদি (যেমন লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) যৌথভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ সুপারিশ করা হয় এবং এর ভিত্তিতে একটি Co-location পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮২ সালে Co-location পরিকল্পনাটি সংশোধন করে সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Integrated Training System)গড়ে তোলার জন্য সকল (চারটি) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে একীভুত করার প্রস্তাব করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সুযোগ-সুবিধা, বিশেষায়িত অনুষদ সেবা, আন্তঃঅংশগ্রহণকারী সহমর্মিতা উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সুষ্ঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে এ সুপারিশ করা হয়।

৩.০ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে থাকে ঃ

- ☆ বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যদের মতামত
- ☆ মূল্যায়ন ফিডব্যাক (মৌখিক ও লিখিত)
- ☆ গবেষণা কার্যক্রম
- ☆ নবায়ন পাঠক্রম পরিচালনা
- ☆ বিশেষজ্ঞ কমিটি কার্যক্রম

৩.১ বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যদের মতামত

প্রশিক্ষণ পাঠক্রম শুরুর আগে পাঠক্রম প্রশাসন বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যদের সভা আহ্বান করে। সভায় বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ তাঁদের পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, সরকারের মৌলিক নীতি ও কৌশল, প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মৌলিক ভূমিকা বিশ্লেষণ (Basic Role Analysis), আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও

প্রশাসনিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation nalysis), আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তন, প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে পাঠক্রম প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করেন।

৩.২ মূল্যায়ন ফিডব্যাক

পাঠক্রমের গুণগত মান উন্নয়নে কেন্দ্রের মূল্যায়ন অনুবিভাগ প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। এ মূল্যায়ন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ পাঠক্রমের মৌখিক এবং লিখিত (নির্ধারিত ছকে) মূল্যায়ন করে থাকেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে রচিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সমূহ পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যদের মতামতের জন্য উপস্থাপিত হয়। বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে কোন বিষয় উপযোগী বিবেচিত হলে পাঠক্রমে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩.৩ গবেষণা কার্যক্রম

বিপিএটিসির বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ যাবৎ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং পাঠক্রম উন্নয়ন সম্পর্কে ১৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই সকল গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল ও সুপারিশমালা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.৪ নবায়ন পাঠক্রম পরিচালনা

বিপিএটিসি পরিচালিত পাঠক্রমের চাহিদা ও ফলপ্রসূতা নির্ণয়ের জন্য নবায়ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা করে থাকে। এ যাবৎ বিপিএটিসি উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ১০টি, মধ্য সোপানের কর্মকর্তাদের জন্য ৯টি এবং বুনিয়াদি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ৬টি নবায়ন পাঠক্রম পরিচালনা করেছে। নবায়ন পাঠক্রমে সাধারণত নিম্নলিখিত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে ঃ

ক। কর্মজীবনে পরিচালিত পাঠক্রমের ফলপ্রসূতা/উপযোগিতা নির্ণয় ; এবং

খ। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠক্রমের গুণগত মান উন্নয়ন।

৩.৫ বিশেষজ্ঞ কমিটি কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ পাঠক্রম প্রণয়নে কেন্দ্র কখনো কখনো কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে। কমিটি তাদের বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, সমকালীন পুস্তিকাদি পর্যালোচনাসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনান্তে খসড়া

পাঠক্রম প্রণয়ন করেন। প্রণীত খসড়া পাঠক্রমটি পরবর্তী পর্যায়ে অনুষদ সভায় পেশ করা হয়। উপস্থিত অনুষদ সদস্যদের বিশেষায়িত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাঠক্রমটি চূড়ান্ত করা হয়।

৪.০ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাবলী

ক। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা নিরূপণ,

খ। নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ,

গ। বিপিএটিসি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যক্রমটি চাহিদা ভিত্তিক কিনা তা নির্ধারণ,

ঘ। প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদার বিশ্লেষণ এবং জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনে প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ।

৫.০ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ প্রবন্ধে তথ্য ও উপাত্তাদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকেই সংগৃহীত। পাঠক্রমের ইতিবৃত্ত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত (পাদটিকা ও তথ্য পঞ্জি ঃ সংযোজনী-খ)। তথ্য বিশ্লেষণ অধ্যায়টি নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত।

তথ্য সংগ্রহের জন্য দু'টি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল (একটি প্রশিক্ষণ পূর্ব অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ অধিবেশনে অংশগ্রহণের পূর্বে, অপরটি প্রশিক্ষণোত্তর অর্থাৎ প্রতিটি উপ-অবয়বের শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন সমাপনান্তে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর)। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে অধিবেশনসমূহ সম্পর্কে ধারণা হওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ যাতে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণভাবে মতামত পোষণ করতে পারেন সে জন্যে এ মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের ফলে তাঁদের ধ্যান ধারণায় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা তা উদঘাটন করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দৈব চয়নের মাধ্যমে মোট ৬৬জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স, চাকরির অভিজ্ঞতা ও ক্যাডার ভিত্তিক সংখ্যা সারণী-২এ উপস্থাপিত হয়েছেঃ

সারণী২ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স, চাকরির অভিজ্ঞতা ও ক্যাডার ভিত্তিক সংখ্যা

বিসিএস ক্যাডার	প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ও অভিজ্ঞতা				
	সংখ্যা	বয়স (উর্ধ্বসীমাসহ)	সংখ্যা	অভিজ্ঞতা (উর্ধ্বসীমাসহ)	সংখ্যা
প্রশাসন	৩৪	২০-২৫	০ (০)	১-৫	৩৪ (৫৯.৫)
বিচার	৮	২৫-৩০	৩০ (৪৫.৫)	৫-১০	১৩ (১৯.৭)
স্বাস্থ্য	১৯	৩০-৩৫	১০ (১৫.২)	১০-১৫	৮ (১২.১)
প্রকৌশল (জনস্বাস্থ্য)	১	৩৫-৪০	৯ (১৩.৬)	১৫-২০	৮ (১২.১)
ডাক	১	৪০-৪৫	৯ (১৩.৬)	২০-২৫	৩ (৪.৬)
শুল্ক ও আবগারী	১	৪৫-৫০	৮ (১২.১)	–	–
অর্থনীত প্রকৌশল	১ ১	–	–	–	–
মোট	৬৬	–	৬৬ (১০০)	–	৬৬ (১০০)

উপর্যুক্ত ৬৬জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৪.৫% উত্তরদাতার বয়স ত্রিশোর্ধ, ৩৯.৩% পয়ত্রিশোর্ধ, ২৫.৭% চল্লিশোর্ধ এবং ১২.১% পয়তাল্লিশোর্ধ। তাঁদের গড় বয়স ৩৪ এবং সরকারী চাকুরির গড় অভিজ্ঞতা ৭.৭ বছর। ২৮.৮% উত্তরদাতার চাকুরির অভিজ্ঞতা ১০ বছরের অধিক এবং ১৬.৭% কর্মকর্তার ১৫ বছরের অধিক।

৬.০ পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

"বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণঃ বাংলাদেশ চর্চা প্রসঙ্গ"প্রবন্ধে নিম্নবর্ণিত চলকসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে ঃ

* প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের সাথে বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা
* বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ
* বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পূর্ব এবং প্রশিক্ষণোত্তর চাহিদা বিশ্লেষণ
* প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ

এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রণীত 'বাংলাদেশ চর্চা' বিষয়ের চাহিদা ও কার্যকারিতা

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়াবলী, যথা ঃ লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন অর্থনীতি এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৭.০ উপাত্ত বিশ্লেষণ

এ প্রবন্ধে শুধুমাত্র বাংলাদেশ চর্চা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধে অধিবেশনের শিরোনামের পরিবর্তে অধিবেশন কোড (সংযোজনী-ক) ব্যবহার করা হয়েছে।

৭.১ বাংলাদেশ চর্চা

৭.১১ উপ-অবয়ব: বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি সমূহ

সারণী-৩ এ প্রদর্শিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী উপর্যুক্ত উপ-অবয়বের সকল অধিবেশন উত্তরদাতাদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর মতামত খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। গড়ে ৯৪.৫% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটি কর্মজীবনের জন্য প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেবল ৫.৫% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করেন। অপরদিকে ৭৭.২% (৫০.২+২৭) প্রশিক্ষণার্থী গড়ে উপ-অবয়বটি যথেষ্ট বা তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন (৭৬.৪% প্রশিক্ষণ পূর্ব এবং ৭৭.৯% প্রশিক্ষণোত্তর)। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অধিবেশন-সমূহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সারণী-৩ঃ কর্মজীবনে ''বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপর্ণ নীতিসমূহ'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসংগিকতা

মতামত	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪.৮	১৮.৮	২৩.৬	৪৮.৪	২৮.০	৭৬.৪
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৬.৩	১৫.৮	২২.১	৫২.০	২৫.৯	৭৭.৯
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১.৫ (বৃদ্ধি)	৩.০ (হ্রাস)	১.৫ (হ্রাস)	৩.৬ (বৃদ্ধি)	২.১ (হ্রাস)	১.৫ (বৃদ্ধি)
গড়	৫.৫	১৭.৩	২২.৮	৫০.২	২৭.০	৭৭.২

সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বের সকল অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (সারণী-৪)।প্রশিক্ষণপূর্ব মতামত অনুযায়ী উপ-অবয়বে সার্বিকভাবে ৯৫.২% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (২৩.১% সামান্য, ৪৭.৬% যথেষ্ট এবং ২৪.৫% অনেক)। মাত্র ৪.৮% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ৭২.১% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টের অধিক বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা ৭২.১% থেকে ৩৯.১% এ হ্রাস পেয়েছে। অন্য কথায় প্রশিক্ষণে ৩৩% শিক্ষণ (Learning) সম্ভব হয়েছে।

সারণী-৪ এ প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তার একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো ঃ

সারণী-৪ ঃ ''বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪.৮	২৩.১	২৭.৯	৪৭.৬	২৪.৫	৭২.১
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	২১.৬	৩৯.৩	৬০.৯	২৯.৮	৯.৩	৩৯.১
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৬.৮ (বৃদ্ধি)	১৬.২ (বৃদ্ধি)	৩৩.০ (বৃদ্ধি)	১৭.৮ (হ্রাস)	১৫.২ (হ্রাস)	৩৩.০ (হ্রাস)

উপর্যুক্ত সারণীতে প্রতীয়মান হয় যে ''মোটেও না'' এবং ''সামান্য'' প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর যথাক্রমে শতকরা ১৬.৮ এবং ১৬.২ (৩৩%) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ''যথেষ্ট ও অনেক'' প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে শতকরা ১৭.৮ এবং ১৫.২ (৩৩%) হারে হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ৩৩% যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়ে 'মোটেওনা' এবং সামান্য প্রয়োজনীয়তায় স্থানান্তরিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাচ-৮ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (৪৩.৫%) হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৫)। এ হ্রাস বাচ-৯ অধিবেশনের ক্ষেত্রে বাচ-৮ এর কাছাকাছি (৪৩.৪%)। বাচ-৪ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বনিম্ন (১৭.৭%) হ্রাস পেয়েছে।

প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে বাচ-২ সর্বাধিক (২৩.৭%), বাচ-৬ দ্বিতীয় সর্বাধিক (২২.৩%) এবং বাচ-৯ সর্বনিম্ন (১০.৫%০। প্রশিক্ষণের অনেক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে বাচ-৯ সর্বাধিক (৩২.৯%) এবং বাচ-৮ দ্বিতীয় সর্বাধিক (৩০.৭%)। এক্ষেত্রে বাচ-৪ এর স্থান সর্বনিম্ন (১.১%)।

সারণী ৫ঃ অধিবেশন-ভিত্তিক ''বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)								
	বাচ-১	বাচ-২	বাচ-৩	বাচ-৪	বাচ-৫	বাচ-৬	বাচ-৭	বাচ-৮	বাচ-৯
ক) যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা -প্রশিক্ষণপূর্ব	৪৮.৩	৫৪.৩	৫২.৬	৪৭.২	৪৩.৯	৫০.৮	৪৬.৬	৪১.৪	৪৩.১
-প্রশিক্ষণোত্তর	২৯.১	৩০.৬	৩৬.৭	৩০.৬	২৪.৫	২৮.৫	২৬.৫	২৮.৬	৩২.৬
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৯.২ (হ্রাস)	২৩.৭ (হ্রাস)	১৫.৯ (হ্রাস)	১৬.৬ (হ্রাস)	১৯.৫ (হ্রাস)	২২.৩ (হ্রাস)	২০.১ (হ্রাস)	১২.৮ (হ্রাস)	১০.৫ (হ্রাস)
অনেক প্রয়োজনীয়তা -প্রশিক্ষণপর্ব	২১.৭	২০.৩	২৬.৩	১১.৩	১০.৫	১৫.২	২৪.১	৪৪.৯	৪৪.৯
-প্রশিক্ষণোত্তর	৬.৩	৬.১	৬.২	১০.২	৮.১	৮.২	১২.২	১৪.২	১২.৩
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৫.৪ (হ্রাস)	১৪.২ (হ্রাস)	২০.১ (হ্রাস)	১.১ (হ্রাস)	২.৪ (হ্রাস)	৭.০ (হ্রাস)	১১.৯ (হ্রাস)	৩০.৭ (হ্রাস)	৩২.৯ (হ্রাস)
নেট (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৪.৬ (হ্রাস)	৩৭.৯ (হ্রাস)	৩৬.০ (হ্রাস)	১৭.৭ (হ্রাস)	২১.৯ (হ্রাস)	২৯.৩ (হ্রাস)	৩২.০ (হ্রাস)	৪৩.৫ (হ্রাস)	৪৩.৪ (হ্রাস)

সারণী-৬ অনুযায়ী প্রশিক্ষণপূর্ব প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদায় ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

সারণী-৬ ''বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	৪.৮	২০.৯	২৫.৭	৪৮.০	২৬.৩	৭৪.৩
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৪.০	২৭.,৭	৪১.৭	৪০.৮	১৭.৫	৫৮.৩
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৯.২ (বৃদ্ধি)	৬.৮ (বৃদ্ধি)	১৬.০ (বৃদ্ধি)	৭.২ (হ্রাস)	৮.৮ (হ্রাস)	১৬.০ (হ্রাস)

প্রশিক্ষণ চাহিদা 'মোটেও না' ৪.৮% থেকে ১৪% এ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রকৃত বৃদ্ধি ৯.২%)। অর্থাৎ ৯.২% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের চাহিদা লোপ পেয়েছে। প্রশিক্ষণের সামান্য চাহিদাও ২০.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৭% এ দাঁড়িয়েছে (প্রকৃত বৃদ্ধি ৬.৮%)। অপরদিকে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা যথাক্রমে ৭.২% এবং ৮.৮% এ (মোট ১৬%)হ্রাস পেয়েছে। চাহিদার এ পরিবর্তন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রমাণ করে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা ৭৪.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫৮.৩% এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পরও ৫৮% চাহিদা বিদ্যমান। এ চাহিদা ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ চাহিদা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষণ কখনোই সম্ভব নয়। এজন্য প্রশিক্ষণকে অব্যাহত প্রক্রিয়া (Continuous Process)হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই প্রশিক্ষণ চাহিদা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় না। এ প্রক্রিয়া তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়।

সারণী-৭ এ অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার ফলাফল উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ-৯ অধিবেশনে সর্বাধিক পরিবর্তন (২৩.২%) পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাচ-৩ দ্বিতীয় সর্বাধিক (২২%) এবং বাচ-৪ সর্বনিম্ন (০.৭%)।

যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাসে বাচ-৭ সর্বাধিক (১৬.৬%), বাচ-৬ দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৪.৮%) এবং বাচ-৯ সর্বনিম্ন (৩.৬%)। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাচ-৯ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদা ৩.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের অনেক চাহিদা ২৬.৮% হ্রাস পাওয়াতে সার্বিকভাবে প্রকৃত হ্রাস ২৩.২% (সর্বাধিক)। প্রশিক্ষণের অনেক চাহিদা নিরসনেও বাচ-৯ সর্বাধিক (২৬.৮%) স্থান অধিকার করে আছে। গড়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদা ৭.২% এবং অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা ৮.৮% হ্রাস পাওয়ায় যথেষ্ট বা তার অধিক প্রশিক্ষণ চাহিদার মোট হ্রাসের হার ১৬%।

কোন কোন অধিবেশনে প্রশিক্ষণ চাহিদায় নেতিবাচক তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও সার্বিক ফলাফল ইতিবাচক। বাচ ৪, বাচ-৫, বাচ-৭,এবং বাচ-৯ এ প্রশিক্ষণ চাহিদা যথাক্রমে ১.৯%, ১.৫%, ০.৮% এবং ৩.৬% বৃদ্ধি পেলেও ঐ সকল অধিবেশনে সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা যথাক্রমে ০.৭%, ৭.৫%, ১৫,৮% এবং ২৩.২% হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-৭ঃ অধিবেশন ভিত্তিক "বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ" উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)								
	বাচ-১	বাচ-২	বাচ-৩	বাচ-৪	বাচ-৫	বাচ-৬	বাচ-৭	বাচ-৮	বাচ-৯
ক) যথেষ্ট চাহিদা - প্রশিক্ষণপূর্ব -প্রশিক্ষনোত্তর	৪৭.৫ ৪৪.৮	৫৩.৪ ৪৪.৪	৫৬.৯ ৪৩,৮	৪৬.৯ ৪৪.৩	৪৬.২ ৩৭.২	৫৫.০ ৪০.২	৫১.০ ৩৪.৪	৩৭.৬ ৩৬.৭	৩৭.০ ৪০.৬
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২.৭ (হ্রাস)	৯.০ (হ্রাস)	১৩.১ (হ্রাস)	২.৬ (হ্রাস)	৯.০ (হ্রাস)	১৪.৮ (হ্রাস)	১৬.৬ (হ্রাস)	০.৯ (হ্রাস)	৩.৬ (বৃদ্ধি)
খ) অনেক চাহিদাঃ -প্রশিক্ষণ পূর্ব - প্রশিক্ষণোত্তর	২৪.২ ৮.৩	২২.০ ১৩.৪	২৭.৬ ১৮.৭	১১.৫ ১৩.৪	১১.৯ ১৩.৪	১৭.০ ১৪.৪	২২.২ ২৩.০	৪৭.৯ ২৭.৬	৫১.৮ ২৫.০
তার তম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৫.৯ (হ্রাস)	৮.৬ (হ্রাস)	৮.৯ (হ্রাস)	১.৯ (হ্রাস)	১.৫ (হ্রাস)	২.৬ (হ্রাস)	০.৮ (হ্রাস)	২০.৩ (হ্রাস)	২৬.৮ (হ্রাস)
নেট তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৮.৬ (হ্রাস)	১৭.৬ (হ্রাস)	২২.০ (হ্রাস)	০.৭ (হ্রাস)	৭.৫ (হ্রাস)	১৭.৪ (হ্রাস)	১৫.৮ (হ্রাস)	২১.২ (হ্রাস)	২৩.২ (হ্রাস)

৭.১.২ উপ-অবয়ব ঃ বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

সারণী-৮ এ প্রদর্শিত প্রশিক্ষণপূর্ব পরিসংখ্যানে সার্বিকভাবে ৯১.২% (২৮.৫% সামান্য, ৩৮.২% যথেষ্ট এবং ২৪.৫% অনেক) প্রশিক্ষণার্থী উক্ত উপ-অবয়বটি কর্মজীবনের জন্য প্রাসংগিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেবল ৮.৮% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণোত্তর মতামত প্রশিক্ষণপূর্ব মতামত অপেক্ষা অধিকতর ইতিবাচক। অর্থাৎ প্রশিক্ষণোত্তর মতামতে-কর্মজীবনে উপ-অবয়বের অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণোত্তর পর্ব পরিসংখ্যানে উপ-অবয়বের কর্মজীবনে যথেষ্ট ও অনেক গুরুত্ব যথাক্রমে ৪.৩% এবং ১১% বৃদ্ধি পেয়েছে (মোট ১৫.৩%)। অপরদিকে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সামান্য গুরুত্বপূর্ণ যথাক্রমে ২.৪% এবং ১২,৯% হ্রাস পেয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই ফলাফল ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যকথায় উভয়ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব-বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে উপ-অবয়বটি ৯২.৪% ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে, তন্মধ্যে ২২.০৫% সামান্য, ৪০.৩৫% যথেষ্ট এবং ৩০% অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ৭০.৩৫% ক্ষেত্রে এ গুরুত্ব যথেষ্টের অধিক।

সারণী-৮ঃ কর্মজীবনে ''বাংলাদেশের সম্পদসমূহ'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

মতামত	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসংগিকতা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	৮.৮	২৮.৫	৩৭.৩	৩৮.২	২৪.৫	৬২.৭
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৬.৪	১৫.৬	২২.০	৪২.৫	৩৫.৫	৭৮.০
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২.৪ (হ্রাস)	১২.৯ (হ্রাস)	১৫.৩ (হ্রাস)	৪.৩ (বৃদ্ধি)	১১.০ (বৃদ্ধি)	১৫.৩ (বৃদ্ধি)

প্রশিক্ষণ পূর্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী (সারণী-৯) ৯২.৬% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (৩১.৩% সামান্য, ৩৮.৭% যথেষ্ট এবং ১৯.৬% অনেক)। যথেষ্ট বা তার অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার হার ৬১.৩%। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর এ প্রয়োজনীয়তা ২৫% হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা ৬১.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৬.৩% এ উপনীত হয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ পূর্বের ৭.৪% প্রশিক্ষণার্থীর পরিবর্তে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ২৬% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করেন না। এক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ফলাফল প্রমাণিত হয়েছে।

সারণী-৯ঃ ''বাংলাদেশের সম্পদসমূহ'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৭.৪	৩১.৩	৩৮.৭	৪১.৭	১৯.৬	৬১.৩
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	২৬.০	৩৭.৭	৬৩.৭	২০.৮	১৫.৫	৩৬.৩
তারতাম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৮.৬ (বৃদ্ধি)	৬.৪ (বৃদ্ধি)	২৫.০ (বৃদ্ধি)	২০.৯ (হ্রাস)	৪.১ (হ্রাস)	২৫.০ (হ্রাস)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বাচ-১৩ অধিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-১০) এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ৩৮.% হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণের অনেক প্রয়োজনীয়তা হার ৬.৪% বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের হার ৩২.৬% (৩৮.৯-৬.৩)।

বাচ-১৪ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বনিম্ন হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ৭.২% হ্রাস এবং অনেক প্রয়োজনীয়তা ৮.৭% হ্রাস পেয়ে প্রকৃত হ্রাসের পরিমাণ ১৫.৯% এ উপনীত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বনিম্ন ১৫.৯% থেকে সর্বোচ্চ ৩২.৬% পর্যন্ত লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। এ ফলাফল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সারণী-১০ অধিবেশনের ভিত্তিক ''বাংলাদেশের সম্পদসমূহ'' উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)							
	বাচ-১০	বাচ-১১	বাচ-১২	বাচ-১৩	বাচ-১৪	বাচ-১৫	বাচ-১৬	বাচ-১৭
ক। যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা								
-প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪৪.৩	৪৮.৪	৩৭.৭	৫২.৫	৩৩.৯	৩৫.০	৪৩.৯	৩৬.৮
-প্রশিক্ষণোত্তর	২৪.৪	২৪.৪	১৯.৬	১৩.৬	২৬.৭	২০.০	২২.২	১৫.২
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৯.৯ (হ্রাস)	২৪.০ (হ্রাস)	১৮.১ (হ্রাস)	৩৮.৯ (হ্রাস)	৭.২ (হ্রাস)	১৫.০ (হ্রাস)	২১.৭ (হ্রাস)	২১.৬ (হ্রাস)
খ। অনেক প্রয়োজনীয়তা								
প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৪.৫	১৯.৪	২১.৪	১৬.৪	২২.০	২৮.১	১০.৬	১৪.০
-প্রষিক্ষণোত্তর	২০.০	১৫.৬	১৫.৩	২২.৭	১৩.৩	১৭.৮	৮.৯	১০.৯
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৪.৫ (হ্রাস)	৩.৮ (হ্রাস)	৬.১ (হ্রাস)	৬.৩ (বৃদ্ধি)	৮.৭ (হ্রাস)	১০.৩ (হ্রাস)	১.৭ (হ্রাস)	৩.১ (হ্রাস)
নেট (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৪.৪ (হ্রাস)	২৭.৮ (হ্রাস)	২৪.২ (হ্রাস)	৩২.৬ (হ্রাস)	৫.৯ (হ্রাস)	২৫.৩ (হ্রাস)	২৩.৪ (হ্রাস)	২৪.৭ (হ্রাস)

সারণী-১১ অনুযায়ী যথেষ্ট বা তার অধিক প্রশিক্ষণ চাহিদা ৪.৯% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের ''মোটেও না'' চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব ৮.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৩% এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আরো ৮.২% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের চাহিদা নেই বলে অভিমত পোষণ করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ফলাফল ইতিবাচক। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সারণী-১১ ''বাংলাদেশের সম্পদসমূহ'' উপ অবয়বে প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	৮.১	৩০.০	৩৮.১	৪০.০	২১.৯	৬১.৯
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৬.৩	২৬.৭	৪৩.০	৩১.৫	২৫.৫	৫৭.০
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৮.২ (বৃদ্ধি)	৩.৩ (হ্রাস)	৪.৯ (বৃদ্ধি)	৮.৫ (হ্রাস)	৩.৬ (বৃদ্ধি)	৪.৯ (হ্রাস)

সারণী-১২ এ অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাচ-১৩ অধিবেশনে সর্বাধিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদা ১৭% হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক চাহিদা

৪.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকৃত হ্রাসের হার ১২.২%। বাচ-১৪, বাচ-১৬ এবং বাচ-১৭ অধিবেশনসমূহে প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সামান্য ও মোটেও না চাহিদায় ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মতামত	বাচ-১৪		বাচ-১৬		বাচ-১৭	
	মোটেও না	সামান্য	মোটেও না	সামান্য	মোটেও না	সামান্য
প্রশিক্ষণ পূর্ব প্রশিক্ষণোত্তর	৯.৫ ১৫.৫	৩৫.৪ ২৬.৭	১১.২ ১৬.৭	৩৭.৯ ৩১.১	১৩.২ ১৮.৭	৪৩.০ ৩০.৮
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬.০ (বৃদ্ধি)	৮.৭ (হ্রাস)	৫.৫ (বৃদ্ধি)	৬.৮ (হ্রাস)	৫.৫ (বৃদ্ধি)	১২.২ (হ্রাস)

সারণী-১২ঃ অধিবেশন ভিত্তিক "বাংলাদেশের সম্পদ সমূহ" উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)							
	বাচ-১০	বাচ-১১	বাচ-১২	বাচ-১৩	বাচ-১৪	বাচ-১৫	বাচ-১৬	বাচ-১৭
ক) যথেষ্ট চাহিদা -প্রশিক্ষণ পূর্ব -প্রশিক্ষণোত্তর	 ৩৮.৬ ২৫.৩	 ৫২.৯ ৩৯.০	 ৪২.৯ ৩২.৯	 ৪৪.০ ২৭.০	 ৩৪.৫ ৩৪.৪	 ৩৪.২ ২৮.৯	 ৩৮.৮ ৩৩.৩	 ৩৩.৩ ৩১.৮
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৩.৩ (হ্রাস)	১৩.৯ (হ্রাস)	১০.০ (হ্রাস)	১৭.০ (হ্রাস)	০.১ (হ্রাস)	৫.৩ (হ্রাস)	৫.৫ (হ্রাস)	১.৫ (হ্রাস)
খ) অনেক চাহিদা -প্রশিক্ষণ পূর্ব -প্রশিক্ষনোত্তর	 ৩২.০ ৩৭.৪	 ২১.৫ ২২.০	 ২১.০ ২৪.২	 ২৫.৫ ৩০.৩	 ২০.৬ ২৩.৪	 ৩১.৬ ২৮.৯	 ১২.১ ১৮.৯	 ১০.৫ ১৮.৭
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৫.৪ (বৃদ্ধি)	০.৫ (বৃদ্ধি)	৩.২ (বৃদ্ধি)	৪.৮ (বৃদ্ধি)	২.৮ (বৃদ্ধি)	২.৭ (বৃদ্ধি)	৬.৮ (বৃদ্ধি)	৮.২ (বৃদ্ধি)
নেট তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৭.৯ (হ্রাস)	১৩.৪ (হ্রাস)	৬.৮ (হ্রাস)	১২.২ (হ্রাস)	২.৭ (বৃদ্ধি)	২.৬ (হ্রাস)	১.৩ (বৃদ্ধি)	৬.৭ (বৃদ্ধি)

৭.১.৩ উপ-অবয়ব উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন

সারণী-১৩ অনুযায়ী উপ-অবয়ব উন্নয়ন ও প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর পরিসংখ্যান খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ৯৬.৮% উত্তরদাতার প্রশিক্ষণপূর্ব মতামত অনুযায়ী উপ-অবয়বটি কর্মজীবনের জন্য প্রাসংগিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার ৯৬.৫% এবং গড় হার ৯৬.৬%। যথেষ্ট বা তার অধিক মতামত প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮১.৬%। প্রশিক্ষণপূর্ব

পরিসংখ্যান অপেক্ষা এ হার ১.৬% বেশী। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এ তারতম্য খুবই সামান্য। তবে উভয় ক্ষেত্রেই উপ-অবয়ব উত্তরটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

সারনী-১৩ঃ কর্মজীবনে ''উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

মতামত	কর্ম জীবনে 'উপ-অবয়বের গুরত্ব/প্রাসংগিকতা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	৩.২	১৬.৮	২০.০	৩৪.৪	৪৫.৬	৮০.০
খ) প্রশিক্ষণোত্তরে	৩.৫	১৪.৯	১৮.৪	৪৫.০	৩৬.৬	৮১.৬
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	০.৩ (বৃদ্ধি)	১.৯ (হ্রাস)	১.৬ (হ্রাস)	১০.৬ (বৃদ্ধি)	৯.০ (হ্রাস)	১.৬ (বৃদ্ধি)
গড়	৩.৪	১৫.৮	৯.২	৩৯.৭	৪১.১	৮০.৮

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে ৯৭.৬% প্রশিক্ষাণার্থী (সারণী-১৪) উপ-অবয়বটিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তম্মধ্যে যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা ৮৩.৬% (৩৯.৪+৪৪.২)। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ প্রয়োজনীয়তা ৮৩% থেকে ৫৩% এ হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এহেন পরিবর্তন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

প্রশিক্ষণ পূর্ব মতামত অনুযায়ী ২.৪% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। অপরদিকে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার ১২.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১৫% প্রশিক্ষণার্থী উপ-অবয়বটিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। এ ফলাফলও প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সারণী-১৪ঃ ''উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন'' উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২.৪	১৪.০	১৬.৪	৩৯.৪	৪৪.২	৮৩.৬
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৫.০	৩২.,০	৪৭.০	৩৭.৪	১৫.৬	৫৩.০
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১২.৬ (বৃদ্ধি)	১৮.০ (বৃদ্ধি)	৩০.৬ (বৃদ্ধি)	২.০ (হ্রাস)	২৮.৬ (হ্রাস)	৩০.৬ (হ্রাস)

সারণী ১৫ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে বাচ-২১ অধিবেশনে সর্বাধিক (৪৩%) এবং বাচ-১৯ অধিবেশনে সর্বনিম্ন (২৩%) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বাচ-২১ ও বাচ-২২ অধিবেশন দু'টিতে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে ৮.৪% (সর্বাধিক) এবং ৮-২% (দ্বিতীয় সর্বাধিক) হ্রাস পেয়েছে।

অপরদিকে বাচ-১৮ ও বাচ-২১ অধিবেশন দু'টিতে অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে ৩৫.৮% (সর্বাধিক) এবং ৩৪.৬% (দ্বিতীয় সর্বাধিক) হ্রাস পেয়েছে। বাচ-১৯, বাচ-২৩ এবং বাচ-২৪ অধিবেশন সমূহে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তায় নেতিবাচক ফলাফল প্রতিফলিত হলেও সার্বিকভাবে নেট ফলাফল ইতিবাচক। সুতরাং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল অধিবেশনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সারণী-১৫ঃ অধিবেশন ভিত্তিক ''উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরা)							
	বাচ-১৮	বাচ-১৯	বাচ-২০	বাচ-২১	বাচ-২২	বাচ-২৩	বাচ-২৪	বাচ-২৫
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন -প্রশিক্ষণ পূর্ব -প্রশিক্ষণোত্তর	৩৪.৮ ৩৩.৩	৪৫.৫ ৫০.০	৪০.৪ ৩২.৭	৪৩.৮ ৩৫.৪	৩৬.৮ ২৮.৬	৩৫.০ ৩৯.২	৩৪.৫ ৩৭.৫	৪৫.৬ ৪০.৮
তারতাম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১.৫ (হ্রাস)	৪.৫ (বৃদ্ধি)	৭.৭ (হ্রাস)	৮.৪ (হ্রাস)	৮.২ (হ্রাস)	৪.২ (বৃদ্ধি)	৩.০ (বৃদ্ধি)	৪.৮ (হ্রাস)
খ) অনেক প্রয়োজন -প্রশিক্ষণপূর্ব -প্রশিক্ষণোত্তর	৪২.০ ৬.২	৪১.৮ ১৪.৩	৪২.১ ২২.৪	৪৯.২ ১৪.৬	৪৭.৪ ২০.৪	৪৭.৫ ১৫.২	৪৭.৩ ১৪.৬	৩৬.৯ ১৬.৩
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৫.৮ (হ্রাস)	২৭.৫ (হ্রাস)	১৯.৭ (হ্রাস)	৩৪.৬ (হ্রাস)	২৭.০ (হ্রাস)	৩২.৩ (হ্রাস)	৩২.৭ (হ্রাস)	২০.৬ (হ্রাস)
নেট (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৭.৩ (হ্রাস)	২৩.০ (হ্রাস)	২৭.৪ (হ্রাস)	৪৩.০ (হ্রাস)	৩৫.২ (হ্রাস)	২৮.১ (হ্রাস)	২৯.৭ (হ্রাস)	২৫.৪ (হ্রাস)

সারণী-১৬ অনুযায়ী প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে যথেষ্ট ও তার অধিক প্রশিক্ষণ চাহিদা ৮১.৮% থেকে ৬৭.৩% এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ চাহিদা ১৪.৫% হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে সামান্য এবং 'মোটেও না' প্রশিক্ষণ চাহিদা সমহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদার তীব্রতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সারণী-১৬ঃ ''উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন'' উপ-অবয়ের প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষনোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেস্ট	অনেক	মোট
ক। প্রশিক্ষণ পর্ব খ। প্রশিক্ষণোত্তর	২.৮ ৯.৩	১৫.৪ ২৩.৪	১৮.২ ৩২.৭	৩৭.০ ৪১.২	৪৪.৮ ২৬.১	৮১.৮ ৬৭.৩
তারতম্য (হ্রাস বৃদ্ধি)	৬.৫ (বৃদ্ধি)	৮.০ (বৃদ্ধি)	১৪.৫ (বৃদ্ধি)	৪.২ (বৃদ্ধি)	১৮.৭ (হ্রাস)	১৪.৫ (হ্রাস)

সারণী-১৭ ঃ অনুযায়ী যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদার হার বৃদ্ধি পেলেও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ফলে নেট ফলাফল ইতিবাচক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদায় বাচ-২১ সর্বাধিক (২৬%৭), বাচ-১৮ দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৯.৩%) এবং বাচ-২৫ সর্বনিম্ন (৮.৪%) ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সারণী-১৭ঃ অধিবেশন ভিত্তিক ''উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন'' উপ অবয়বের প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)							
	বাচ-১৮	বাচ-১৯	বাচ-২০	বাচ-২১	বাচ-২২	বাচ-২৩	বাচ-২৪	বাচ-২৫
ক) যথেষ্ট চাহিদাঃ -প্রশিক্ষণ পূর্ব প্রশিক্ষণোত্তর	৩৫.৯ ৪০.৮	৪২.০ ৪৮.৬	৩৮.০ ৪০.৮	৪০.৯ ৩৯.২	৩৪.৫ ৩৭.০	৩৩.৯ ৪০.৬	৩০.৯ ৩৮.১	৩৯.৫ ৪৩.৯
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৪.৯ (বৃদ্ধি)	৬.৬ (বৃদ্ধি)	২.৪ (বৃদ্ধি)	১.৭ (হ্রাস)	২.৫ (বৃদ্ধি)	৬.৭ (বৃদ্ধি)	৭.২ (বৃদ্ধি)	৪.৪ (বৃদ্ধি)
খ। অনেক চাহিদা -প্রশিক্ষণপূর্ব -প্রশিক্ষণোত্তর	৩৪.৪ ১০.২	৪২.০ ২৩.৮	৪৫.২ ২৮.৬	৫২.২ ২৭.২	৪৯.১ ৩১.০	৪৭.৮ ২৮.১	৪৯.১ ৩২.০	৪০.৩ ২৭.৫
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৪.২ (হ্রাস)	১৮.২ (হ্রাস)	১৬.৬ (হ্রাস)	২৫.০ (হ্রাস)	১৮.১ (হ্রাস)	১৯.৭ (হ্রাস)	১৭.১ (হ্রাস)	১২.৮ (হ্রাস)
নেট (Net) তারতম্য হ্রাস/বৃদ্ধি	১৯.৩ (হ্রাস)	১১.৬ (হ্রাস)	১৪.২ (হ্রাস)	২৬.৭ (হ্রাস)	১৫.৬ (হ্রাস)	১৩.০ (হ্রাস)	৯.৯ (হ্রাস)	৮.৪ (হ্রাস)

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ের সকল উপ-অবয়বের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী-১৮তে দেয়া হল। উক্ত চিত্র অনুযায়ী উপ-অবয়ব-৩ কর্মজীবনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশিক্ষণ চাহিদার ক্ষেত্রেও উক্ত উপ-অবয়বটি সর্বাধিক কার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

সারনী-১৮ঃ বাংলাদেশ চর্চার সকল উপ-অবয়রের তুলনামূলক চিত্র

উপ-অবয়ব	কর্মজীবনে অধিবেশনের গুরুত্ব/প্রাসংগিকতা (শতকরায়)						প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (শতকরায়)						প্রশিক্ষণ চাহিদা (শতকরায়)					
	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট	মোটেওন না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
প্রশিক্ষণপূর্ব																		
উপ-অবয়ব-১	৪.৮	১৮.৮	২৩.৬	৪৮.৪	২৮.০	৭৬.৪	৪.৮	২৩.১	২৭.৯	৪৭.৬	২৪.৫	৭২.১	৪.৮	২০.৯	২৫.৭	৪৮.০	২৬.৩	৭৪.৩
উপ-অবয়ব-২	৮.৮	২৮.৫	৩৭.৩	৩৮.২	২৪.৫	৬২.৭	৭.৪	৩১.৩	৩৮.৭	৪১.৭	১৯.৬	৬১.৩	৮.১	৩০.০	৩৮.১	৪০.০	২১.৯	৬১.৯
উপ-অবয়ব-৩	৩.২	১৬.৮	২০.০	৩৪.৪	৪৫.৬	৮০.০	২.৪	১৪.০	১৬.৪	৩৯.৪	৪৪.২	৮৩.৬	২.৮	১৫.৪	১৮.২	৩৭.০	৪৪.৮	৮১.৮
মোটঃ	১৬.৮	৬৪.১	৪০.৯	১২১.০	৯৮.১	২১৯.১	১৪.৬	৬৮.৪	৮৩.০	১২৮.৭	৮৮.৩	২১৭.০	১৫.৭	৬৬.৩	৮২.০	১২৫.০	৯৩.০	২১৮.০
গড়ঃ	৫.৬	২১.৪	২৭.০	৪০.০	৩২.৭	৭৩.০	৪.৯	২২.৮	২৭.৭	৪২..৯	২৯.৪	৭২.৩	৫.২	২২.১	২৭.৩	৪১.৭	৩১.০	৭২.৭
প্রশিক্ষনোত্তর																		
উপ-অবয়ব-১	৬.৩	১৫.৮	২২.১	৫২.০	২৫.৯	৭৭.৯	২১.৬	৩৯.৩	৬০.৯	২৯.৮	৯.৩	৩৯.১	১৪.০	২৭.৭	৪১.৭	৪০.৮	১৭.৫	৫৮.৩
উপ-অবয়ব-২	৬.৪	১৫.৬	২২.০	৪২.৫	৩৫.৫	৭৮.০	২৬.০	৩৭.৭	৬৩.৭	২০.৮	১৫.৫	৩৬.৩	১৬.৩	২৬.৭	৪৩.০	৩১.৫	২৫.৫	৫৭.০
উপ-অবয়ব-৩	৩.৫	১৪.৯	১৮.৪	৪৫.০	৩৬.৬	৮১.৬	১৫.০	৩২.০	৪৭.০	৩৭.৪	১৫.৬	৫৩.০	৯.৩	২৩.৪	৩২.৭	৪১.২	২৬.১	৬৭.৩
মোট ঃ	১৬.২	৪৬.৩	৬২.৫	১৩৯.৫	৯৮.০	২৩৭.৫	৬২.৬	১০৯.০	১৭১.৬	৮৮.০	৪০.৪	১২৮.৪	৩৯.৬	৭৭.৮	১১৭.৪	১১৩.৫	৬৯.১	২২১.৭
গড় ঃ	৫.৪	১৫.৪	২০.৮	৪৬.৫	৩২.৭	৭৯.২	২০.৯	৩৬.৩	৫৭.২	২৯.৩	১৩.৫	৪২.৮	১৩.২	২৫.৯	৩৯.১	৩৭.৮	২৩.১	৭৩.৯

৭.১৪ জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ চর্চা

সারণী-১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ চর্চা প্রশিক্ষণে গড়ে ৯৭.৬% প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি হয়েছে বলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অনুভব করেন, (১৬.৫% সামান্য, ৬৫.৯% যথেষ্ট এবং ১৫.২%অনেক)। অর্থাৎ গড়ে যথেষ্ট বা তার অধিক উন্নতির হার ৮১.৯%। উপ-অবয়ব-৩ এ জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বাধিক (৯৯%) এবং উপ-অবয়ব-২এ দ্বিতীয় সর্বাধিক (৯৮.৩) উন্নতি সাধিত হয়েছে। যথেষ্ট বা তার অধিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতিতেও উপ-অবয়ব-৩ সর্বাধিক (৮৩.৪%)।

৭.১৫ দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে বাংলাদেশ চর্চা

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কোন প্রভাব রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামত অনুযায়ী গড়ে ৯৮.৭% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন যে, বাংলাদেশ চর্চা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে সহায়ক (১১.৯% সামান্য, ৬৮.২ যথেষ্ট এবং ১৮.৬% অনেক)। দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে যথেষ্ট বা তার অধিক হার ৮৬.৮%।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে উপ-অবয়ব-২ সর্বাধিক (৯৯.৭%) কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উপ-অবয়ব-৩এর অবস্থানও এ ক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি (৯৯.২%)। যথেষ্ট বা তার অধিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে উপ-অবয়ব-২ ৯০.৯%(সর্বাধিক) এবং উপ-অবয়ব-৩ ৮২.২% (সর্বনিম্ন)। উপ-অবয়ব-১ এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (৮৮.৪%)।

উপর্যুক্ত ফলাফল প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিঙ্গীর পরিবর্তনে বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ের ইতিবাচক প্রভাব প্রমাণ করে।

সারণী-১৯ ঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ চর্চা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণার্থীদেবৃন্দের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

উপ-অবয়ব	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (প্রশিক্ষণোত্তর মতামত)									
	জ্ঞান দক্ষতার উন্নয়ন					দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
উপ-অবয়ব-১	১৮ (৪.২)	৬২ (১৪.৪)	২৯৬ (৬৮.৫)	৫৬ (১২.৯)	৪৩২ (১০০)	১০ (২.৩)	৪০ (৯.৩)	৩২২ (৭৪.৫)	৬০ (১৩.৯)	৪৩২ (১০০)
উপ-অয়ব-২	৬ (১.৭)	৭০ (২০.২)	২০৯ (৬০.২)	৬২ (১৭.৯)	৩৪৭ (১০০)	১ ০.৩)	২৬ (৮.৮)	২০৪ (৬৯.৫)	৬০ (২১.৪)	২৯৪ (১০০)
উপ-অবয়ব-৩	৪ (১.০)	৬১ (১৫.৬)	২৬৭ (৬৮.১)	৬০ ১৫.৩)	৩৯২ (১০০)	৩ (০.৮)	৬৭ (১৭.০)	২৩৭ (৬০.৩)	৮৬ (২১.৯)	৩৯৩ (১০০)
মোট	২৮ (২.৪০	১৯৩ ১৬.৫০	৭৭২ (৬৫.৯)	১৭৮ (১৫.২)	১১৭১ (১০০)	১৪ (১.৩)	১৩৩ (১১.৯)	৭৬৩ ৬৮.২	২০৯. (১৮.৬)	১১১৯ (১০০)

সংযোজনী-ক

পাঠ্যক্রম তালিকা

বাংলাদেশ চর্চা

উপ অবয়ব১ঃ বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

বাচ-১ নীতি বিশ্লেষণ

বাচ-২ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি

বাচ-৩ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি

বাচ-৪ বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি

বাচ-৫ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যনীতি

বাচ-৬ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

বাচ-৭ বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যনীতি

বাচ-৮ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাচ-৯ জনসংখ্যা নীতি

উপ-অবয়ব-২ ঃ বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

বাচ-১০ বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার

বাচ-১১ বাংলাদেশের মানব সম্পদ

বাচ-১২ বাংলাদেশের পানি সম্পদ

বাচ-১৩ বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা

বাচ-১৪ বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা

বাচ-১৫ বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

বাচ-১৬ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

বাচ-১৭ বাংলাদেশের পশু সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

উপ অবয়ব ৩ঃ উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন

বাচ-১৮ সংগঠন তত্ত্বের রূপরেখা

বাচ-১৯ উন্নয়ন প্রশাসনের পটভূমি ও লক্ষ্য

বাচ-২০ বিকেন্দ্রীকরণ: তাত্ত্বিক দিক

বাচ-২১ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (তাত্ত্বিক)

বাচ-২২ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (প্রায়োগিক)

বাচ-২৩ উন্নয়ন প্রশাসনে নেতৃত্ব

বাচ-২৪ জেলা ও উপজেলা পরিষদের আইনগত কাঠামো এবং

বাচ-২৫ স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ

সংযোজনী-ক

পাঠ্যক্রম তালিকা

বাংলাদেশ চর্চা

উপ অবয়ব১ঃ বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

বাচ-১ নীতি বিশ্লেষণ

বাচ-২ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি

বাচ-৩ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি

বাচ-৪ বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি

বাচ-৫ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যনীতি

বাচ-৬ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

বাচ-৭ বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যনীতি

বাচ-৮ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাচ-৯ জনসংখ্যা নীতি

উপ-অবয়ব-২ ঃ বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

বাচ-১০ বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার

বাচ-১১ বাংলাদেশের মানব সম্পদ

বাচ-১২ বাংলাদেশের পানি সম্পদ

বাচ-১৩ বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা

বাচ-১৪ বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা

বাচ-১৫ বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

বাচ-১৬ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

বাচ-১৭ বাংলাদেশের পশু সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

উপ অবয়ব ৩ঃ উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন

বাচ-১৮ সংগঠন তত্ত্বের রূপরেখা

বাচ-১৯ উন্নয়ন প্রশাসনের পটভূমি ও লক্ষ্য

বাচ-২০ বিকেন্দ্রীকরণ: তাত্ত্বিক দিক

বাচ-২১ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (তাত্ত্বিক)

বাচ-২২ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (প্রায়োগিক)

বাচ-২৩ উন্নয়ন প্রশাসনে নেতৃত্ব

বাচ-২৪ জেলা ও উপজেলা পরিষদের আইনগত কাঠামো এবং

বাচ-২৫ স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ

সংযোজনী-খ

তথ্য নির্দেশিকা

1. E. N. G;addem "*A History of Public Administration*" *Vol.2.* (London: Frank cass, 1972), p. 246, quoted in R. K. Sapru, Civil Service Administration in India (New Delhi : Deep & Deep Publications, p. 109.
2. L. S. S. O'Malley, "*General Survey in Modern India and the West* (Oxford: Royal Institute of International Affairs, 1941); quoted in R. K. Sapru, p.109.
3. Fazal Ur Raheem and Aga Iftikhar Husain, "*The Civil Service System in Pakistan" Asian Civil Services: Developments and Trends.* edited by Amara Raksasatya and Heinrich Seidentope (Kualalumpur: APDC, 1980) p. 308.
4. Ibid, p. 308
5. R. K. Sapru, *Civil Service Administraion in India* (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1984), P.,111
6. Report on the Indian Civil Service by T. B. Macaulay (November, 1854), Quoted from the "*Report of the Fulton Committee on the British Civil Service* (1966-68)" Vol.1 pp. 119-128.
7. Fazal Ur Raheem and Aga Iftikhar Hussain, op. cit. p. 310.
8. Quoted from Akbar Ali Khan and Mosharraf Hossain, *Post Entry Training in Bangladesh Civil Service: A Survey of the Problems and Potentials,* (Savar: BPATC), P-3
9. Ali Ahmed, *Role of Higher Civil Servants in Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1968) p. 367.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

নগরায়নের সমস্যা

মোঃ হাসিবুর রহমান *

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রাচীনকালে নগর গড়ে উঠতো শাসকদের শাসনকার্যের প্রাণ-কেন্দ্ররূপে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা রাজধানী নামে পরিচিত হতো। শাসকদের প্রয়োজনে নগরে বিলাস সামগ্রীর সমাহারসহ সর্বপ্রকার বিনোদনের যেমন সমাহার ঘটতো, তেমনি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ বাজার, দোকানপাট, দালান-কোঠা রাস্তাঘাট ও রাজকর্মচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতো। গ্রীসের এথেন্স নগরী, মিশরের কায়রো নগরী, ইরাকের বাগদাদ নগরী, ভারতের দিল্লী নগরী এভাবে রাজধানী নগর হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিত্তশালীদের বাণিজ্য ও প্রমোদের জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন নগরী। তবে সেখানেও শাসকদের কর্মচারীগণের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল। শিল্প বিপ্লবের পরে নগরী স্থাপনের ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। কাঁচা-মালের সহজ প্রাপ্তি, শিল্প স্থাপনের উপযোগিতা, যোগাযোগ ও বাজারজাতকরণের সুবিধা এবং শ্রমিক কর্মচারীদের আবাস নির্মাণের সুযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন নগরী।

১.২ ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরীসমূহ, যেমন মহেনজোদারো, হরপ্পা, অজন্তা, ইলোরা, প্রভৃতি নগরী মূলত রাজধানী রূপেই গড়ে ওঠে। মোঘল ও ইংরেজ আমলে শাসন-কার্যের সুবিধা অনুযায়ী শাসকবৃন্দ দিল্লী, লক্ষ্মৌ, পাঞ্জাব, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি নগরী গড়ে তোলে। রাজকর্মচারীদের প্রয়োজন ও বিনোদনের সকল সামগ্রী দ্বারা এসব নগরী সাজানো হয় এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিটি নগরীতে একটি করে দূর্গ গড়ে তোলা হয়।

১.৩ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতবর্ষে শাসনকার্যের প্রয়োজনে নগরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটানো হয়। প্রদেশ, বিভাগ ও জেলা রূপে গঠিত প্রতিটি শহরকে নগরীর রূপ দানের চেষ্টা করা হয়। গড়ে ওঠে দালান-কোঠা ও রাস্তা-ঘাট। স্থাপন করা হয় বাজার ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা। রেলপথসহ বিদ্যুত সুবিধা প্রদান করে বিত্তশালীদের পাশাপাশি চাকরিজীবী ও শ্রমিকদেরকে আকর্ষণ করা হয় নগরীর প্রতি।

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২.০ নগরায়নের বিস্তৃতি

২১. নগরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি প্রধানত শাসকবর্গের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও শাসন ব্যবস্থাকে নিরাপদ করার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হলেও ভারতবর্ষে নগরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি। তাই বৃটিশের হিসাবমতে ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২-৩ শতাংশ ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই হার মাত্র ৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯০১ সালে অবিভক্ত বাংলা রাজ্যে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ শহরের সংখ্যা ছিল ৫০টি।

২.২ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মোট ২৪টি শহরের অস্তিত্ব দেখা যায়। শহরের অধিবাসীর হার ছিল শতকরা ৪ ভাগেরও কম। ১৯৬১ সাল থেকে এই হার কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই হারের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

একটি সারণীর মাধ্যমে বাংলাদেশের নগরায়ণ প্রবণতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখানো হলো ঃ

১৯০১ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সময় কাল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হারে)	শহর এলাকায় বৃদ্ধির হার (শতকরা হারে)
১৯০১-১৯১১	০.৮৭	১.৩৯
১৯১১-১৯২১	০.৫৩	০.৮৩
১৯২১-১৯৩১	০.৬৮	১.০০
১৯৩১-১৯৪১	১.৬৫	৩.৫৯
১৯৪১-১৯৫১	০.০০	১.৬৮
১৯৫১-১৯৬১	১.৯২	৩.৭২
১৯৬১-১৯৭৪	২.৬৫	৬.৭০
১৯৭৪-১৯৮১	২.৩৬	১১.০০
১৯৮১-১৯৯১	২.০৬	১৯.০

সূত্র ঃ পারসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ : ১৯৯৪

বাংলাদেশে শহর এলাকা বৃদ্ধির হার ১৯৬১, ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সনে যথাক্রমে ৬.৭%, ৯%, ১৩% এবং ২০%।

২.৩ ১৯৮১ সালের আদম শুমারীকালে শহর বা আরবান সেন্টার এর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং কোন একটি গুচ্ছ এলাকায় লোকসংখ্যা ৫ হাজার হলে তাকে শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই হিসেব মতে বাংলাদেশে ৪৯২টি এলাকাকে শহর

হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ফলে ১৯৬১ সালের তুলনায় শহর সংখ্যার বৃদ্ধির হার ঘটে শতকরা ১৫ ভাগ, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

৩.০ নগরায়ন ও নগরবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

৩.১ মাইগ্রেশন বা অভিগমনের প্রধান দুটি কারণ সমাজবিজ্ঞানীগণ নির্ধারণ করেন। একটি Pull Factor অপরটি Push Factor, Pull Factor-এ নগরের জৌলুষ ও জীবন যাত্রার মান গ্রামীণ অধিবাসীকে হাতছানী দিয়ে শহরের দিকে টেনে নেয়। আর Push Factor এ বলা হয় যে, গ্রামীণ অধিবাসী নিতান্ত বাঁচার তাগিদে এবং জীবিকা অর্জনের অপ্রতুলতাসহ অন্যান্য অসুবিধার কারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিগমন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে Pull Factor ততটা কার্যকর নয়, কিন্তু Push Factor ক্রমাগত এত শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে, ১৯৮১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

৩.২ নগর অভিগমনের প্রবণতা ১৯৯১ সালের পরে আরও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চাপ সহ্য করতে হচ্ছে রাজধানী শহর ঢাকা-কে। ১৯৯১ সালে ঢাকা মহানগরীতে ৬০লক্ষ লোকের অবস্থিতি গণনা করা হয়। ১৯৯৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০লক্ষ ছড়িয়ে গেছে। ডেইলী ইন্ডিপেন্ডেন্স পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার বর্তমানের ন্যায় বজায় থাকলে ২০১৫ সালে তা প্রায় ২কোটিতে উন্নীত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আর তখন এই মহানগরী পৃথিবীর নবম বৃহত্তম মহানগরীরূপে পরিগণিত হবে।

৪.০ বাংলাদেশে নগরায়নের কারণসমূহ

৪.১ বাংলাদেশে নগরায়ন তথা দ্রুতগতিতে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রমাগতভাবে মানুষের শহরাঞ্চলে অভিগমনই প্রধান। আর অভিগমনের মূলে Push Factor শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর রয়েছে। অভিগমন ছাড়া নগরায়নের অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে, ১৯৮৩-৮৪সালে সৃষ্ট উপজেলা ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষা ও চাকরি লাভের সুযোগ, স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি।

৪.২ নগরায়নের সবচেয়ে বড় কারণ গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের পেছনে যে সমস্ত কারণ বিদ্যমান, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক) ভূমিহীনের সংখ্যাবৃদ্ধিঃ বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে বর্তমানে ভূমিহীন জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ। এই বিপুল জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকার্জনের কোন উপায় গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তারা দলে দলে নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে আশ্রয় নিচ্ছে। রাজধানী হিসেবে ঢাকা মহানগরীতে এই আশ্রয় গ্রহণের হার সর্বাধিক।

খ) কর্ম সংস্থানের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে ক্রমাগতভাবে কর্ম সংস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্য বিত্তের জন্য চাকরি, এবং বিত্তহীনদের জন্য শ্রম বিক্রির তেমন কোন সুযোগ গ্রামাঞ্চলে নেই। অল্প শিক্ষিত থেকে আরম্ভ করে উচ্চ শিক্ষিতদের সকলকেই চাকরির সন্ধানে ছুটে আসতে হয় শহরাঞ্চলে। চাকরি পেলে তার চাকরিস্থল হয়ে দাঁড়ায় শহরাঞ্চল। ফলে শহরের প্রতি তাদেরকে ধাবমান হতে হচ্ছে।

গ) গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের অত্যাচারঃ গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের অত্যাচার গ্রামাঞ্চলে এত বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে যে উচ্চ বিত্ত, মধ্যবিত্ত সবাইকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে শহরাঞ্চলে। পূর্বের তুলনায় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এখন অত্যন্ত প্রসারিত। অনেকে তাই গ্রামে বাড়ী রেখেও শহরে বাড়ী বানাচ্ছে। তারা গ্রাম্য মহাজন, পাতি-নেতা, টাউট প্রভৃতির জ্বালাতন থেকে বেঁচে নির্বিবাদে জীবন যাপনের জন্য শহরে ধাবিত হচ্ছে।

ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে এখন বলতে গেলে তেমন কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ নেই। সমস্ত সুযোগ এসে পুঞ্জিভূত হয়েছে শহরাঞ্চলে। তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল গ্রামীণ ব্যবসায়ী শহরে থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করছে। গ্রামাঞ্চলের হাটে বেচা-কেনা কম এবং দ্রব্যাদি সংরক্ষণ সুবিধার অভাবের কারণে ব্যবসায়ীরা গ্রামে তাদের ব্যবসা চালানোর বেলায় শহরকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছে।

ঙ) যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবঃ গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনকালের গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা এবং মাথায় করে মালামাল স্থানান্তর ছাড়া তেমন কোন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু শহরাঞ্চলে পাকা রাস্তাসহ বাস, ট্রাক, লঞ্চ, ষ্টিমার, রেলগাড়ী প্রভৃতির প্রাচুর্য রয়েছে। এতে সময় ও অর্থ দু'য়েরই সাশ্রয় ঘটে। সেজন্য মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে এসব সুবিধা পেতে চায়।

চ) বিদ্যুত, গ্যাস ও পানীয় জলের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত নেই, গ্যাসের তো প্রশ্নই ওঠেনা। পানীয় জল প্রাপ্তির জন্যও মানুষকে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকের জন্য এ সব সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। জ্বালানীর অভাবসহ খরা মৌসুমে পানীয় জল প্রাপ্তি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই তারা শহরাঞ্চলে ধাবিত ও বসবাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ছ) বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে আক্রান্ত ঃ নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের জলোচ্ছ্বাস, এবং ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের মহা প্লাবনের ফলে আক্রান্ত এলাকাসমূহের অধিবাসীগণ শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই পূর্বে বিত্তশালী ছিল। যাদের অনেকেই

এখন সহায়-সম্বল এমনকি আশ্রয়হীন। তাই তাদেরকে শহরে আসতে বাধ্য করেছে তাদের ভাগ্য।

জ) চিকিৎসা সুবিধার অভাব ঃ সরকার যদিও ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি করে সরকারী চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা রেখেছে, তবু সেখানে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। প্রাক্তন উপজেলা, বর্তমানে থানা পর্যায়ে একটি করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রয়েছে এবং শল্য চিকিৎসাসহ অন্যান্য চিকিৎসা প্রাপ্তির কিছু সুযোগ সেখানে বিদ্যমান। তাই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধার অভাবে রোগীসহ আত্মীয় পরিজনকে থানা, জেলা অথবা রাজধানী শহরে চিকিৎসা লাভের জন্য আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ঝ) উচ্চ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিকসহ উচ্চতর শিক্ষাসুযোগ প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভের সকল সুযোগই শহরাঞ্চলে বিদ্যমান। তাই শহরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া এসব ক্ষেত্রে গত্যন্তর থাকে না।

৫.০ নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

৫.১ যেহেতু অতীতে সৃষ্ট বেশীরভাগ শহরই অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ছিল। সেহেতু অতিরিক্ত জনসংখ্যারভারে বর্তমানে শহরাঞ্চলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ সমস্যা কেবল বাংলাদেশেই বিদ্যমান, একথা ভাবা ভুল হবে। পৃথিবী ব্যাপী নগরায়নের সমস্যা ক্রমাগত তীব্রতর হয়েছে এবং হচ্ছে।

ইংল্যান্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প নগরীগুলোর কদর্যতায় ক্ষিপ্ত হয়ে এ, হার্ডওয়ার্ড তাঁর "Garden Cities for Tomorrow" গ্রন্থে আধুনিক পরিকল্পিত নগরীর গুরুত্ব এবং রূপরেখা বর্ণনা করেন। তাঁর মতামতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিকল্পিত নগরী গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। আমেরিকায় তখন 'সিটি বিউটি' আন্দোলনের মাধ্যমে শিকাগো শহরে সুরম্য নগর গড়ে ওঠে। ফ্রান্সেও অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং প্যারিস নগরীকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়।

৫.২ বিংশ শতাব্দীতে কতিপয় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা 'ওয়েলফেয়ার সিটি' আন্দোলন আরম্ভ করে এবং নগরগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সাজায়। ১৯৭০ এর দশকে একজন বৃটিশ মন্ত্রী চীনের সাংহাই নগরী ভ্রমণ করে মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর বৃহত্তম শহর সাংহাই একজন সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য কলকাতা, লন্ডন, এমনকি নিউইয়র্কের চাইতেও শ্রেয়।" বৃটিশ প্ল্যানার রবিন হাসান ১৯৭৫ সালে চীনের নগর পরিকল্পনাকে 'সার্থক পরিকল্পনা' বলে অভিহিত করেন।

৫.৩ বাংলাদেশের প্রতিটি মহানগরীতে যদিও একটি করে "উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" নামক সংস্থা সৃষ্টি করে নগর পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে, তবুও

এদেশে প্রায় প্রতিটি শহর এলাকা অপরিকল্পিত। স্বাভাবিক কারণে সবগুলো শহরেই কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যা বিরাজমান। নিম্নে প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচিত হলো ঃ

ক) অপরিকল্পিত আবাসিক ব্যবস্থা ঃ যত্রতত্র পরিকল্পনাবিহীন ভাবে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকা, দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, শপিং সেন্টার এবং কল কারখানার সমাবেশ এক অদ্ভুত সমস্যা সংকুল নগরায়নের প্রমাণ দিয়েছে এদেশে। তাই ঢাকা মহানগরীতে (বনানী ও গুলশান এলাকা ছাড়া) ট্যানারী, নির্মাণ কারখানা, কসাইখানা এবং আবাসিক এলাকা একত্রে অবস্থান করছে। এতে নগরস্বাস্থ্যসহ মানব-স্বাস্থ্যও বিপন্ন হচ্ছে।

খ) অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও পয়:প্রণালী ঃ যত্রতত্র বাড়ী-ঘর সৃষ্টির ফলে রাস্তা-ঘাট সরু ও আঁকা-বাঁকা হয়েছে। অনেক শহরের একটি এলাকা থেকে অপর এলাকায় যাওয়ার রাস্তা বহুদূর ঘুরে তৈরী হয়েছে। ফলে রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভীড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা বিঘ্নিত, বিপদসংকুল ও সময় অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ নগরীতে জলাবদ্ধতা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পয়:প্রণালী ব্যবস্থা আরও করুণ। উপচেপড়া ড্রেন শুধু লজ্জাই দেয়না, কষ্টও দেয়।

গ) বস্তি সমস্যা ঃ প্রায় প্রতিটি শহরে ছিন্নমূল মানুষের ভীড়ে বস্তি সমস্যা এদেশে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কোন শহর বাংলাদেশে নেই যেখানে বস্তি সমস্যা প্রকট নয়। এতে শহরের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়েছে, জন স্বাস্থ্যও মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন।

ঘ) বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুর অভাব ঃ অজস্র যানবাহনের কালো ধোঁয়া কার্বন-ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্যাসের সৃষ্টি করে বায়ু দুষিত করে তুলেছে। মুক্ত বায়ুর অভাব কেবল তীব্র হচ্ছে না, বহুবিধ রোগেরও জন্ম দিচ্ছে। তাছাড়া, অধিক হারে গাছ পালা কেটে বাড়ী ঘর, দালান-কোঠা নির্মাণ করায় অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ছে। মানুষের জীবন ধারণ অসহনীয় হয়ে উঠছে। পরিবেশ দুষণের যাবতীয় উপকরণ বর্তমানে শহরাঞ্চলে বিদ্যমান।

ঙ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত ঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মের অভাব, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের উপায়হীনতা শহরাঞ্চলে সৃষ্টি করছে নানা দুষ্কর্মের সমারোহ। তাই প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, হাইজ্যাক, পকেটমারী ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশী ব্যবস্থা নেই। থাকলেও তা দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নয়। এছাড়া, বিপথগামী যুবকদের নিকট আর কোন পেশা বা জীবন-নির্বাহের পথ না থাকায় তারা এসব ক্ষেত্রে অধিকহারে নিয়োজিত হচ্ছে।

চ) মাদকদ্রব্য সেবন প্রবণতা ঃ এটি বিপথগামী যুবক-যুবতী সহ বহুসংখ্যক মানুষের প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ মাদকদ্রব্য প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়। তাছাড়া সামাজিক অনুশাসনের ফলে মাদকসেবীদের সংখ্যাও সেখানে বেশী নয়। শহরাঞ্চলে সহজপ্রাপ্যতা এবং অসৎসঙ্গ যেমন মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, তেমনি সামাজিক অনুশাসনহীনতার ফলে তা রোধ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

ছ) পতিতাবৃত্তি ও ছদ্মবেশী পতিতালয় বৃদ্ধি ঃ এই পেশাটি পৃথিবীর সকল দেশে নগরায়নের ফলেই প্রধানত সৃষ্টি হয়েছিল। এখনও তা অনেক দেশের শহরাঞ্চলে বিদ্যমান। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রধানত দারিদ্র্য ও কর্ম সংস্থানের অভাবে এর সৃষ্টি। তাছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যধিক অর্থ ও আয়ের আকাঙ্ক্ষা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রায় ৩ লক্ষ মহিলা এই শিল্পে জড়িত। এদের স্বল্প মজুরী এবং আবাসিক সমস্যার ফলে ছদ্মবেশী পতিতালয় সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু, তরুণী ও যুবতী মহিলারাই মূলত পোষাক শিল্পে কর্মরত হওয়ায় তাদেরকে প্রলোভিত করে পতিতাবৃত্তির প্রসার ঘটাচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ।

জ) অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা ঃ গ্রামাঞ্চলের ন্যায় টাটকা ও বিশুদ্ধ খাবার শহরাঞ্চলে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সর্বত্র ভেজাল ও বাসী দ্রব্যের সমাহার। এসব রোধের সরকারি ব্যবস্থা তেমন কার্যকর নয়। ফলে দুরারোগ্য ব্যাধিসহ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে শহরাঞ্চলের মানুষ। নগরায়নের কুফলের মধ্যে এই সমস্যাটি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সর্বাধিক বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

ঝ) দুর্ঘটনা ঃ যানবাহনসহ কলকারখানা এবং বিদ্যুত, গ্যাস প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট নানাবিধ দুর্ঘটনা বাংলাদেশে অত্যন্ত তীব্র। বেপরোয়া গাড়ী চালনা এবং ট্রাফিক আইনের অকার্যকারিতা এর পেছনে দায়ী। তাছাড়া অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাটও বহুলাংশে এসব সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। বিদ্যুতের অবৈধ লাইন নেওয়া এবং গ্যাস ব্যবহারে অসতর্কতাও বহুবিধ দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে থাকে।

ঞ) অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট দুর্নীতি ঃ শহরাঞ্চলে চলে অবাধ প্রতিযোগিতা। আর্থিক অর্জনের ক্ষেত্রে এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে দুর্নীতির উন্মাদনা। অনেক অপচয়ের জন্মদেয় এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা। এতে শুধু ব্যক্তি চরিত্রই নষ্ট হয় না, সমাজের সার্বিক অবনতির জন্ম দেয়।

ট) অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ঃ শহরে কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকেনা। তাই জন্ম নেয় বহুবিধ অপরাধ প্রবণতা। কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাও গ্রামের তুলনায় শহরে বহুগুণ বেশী। এগুলোর পেছনেও প্রতিযোগিতার মনোভাব, হতাশা, কর্মহীনতা এবং মানসিক ক্লান্তি কাজ করে থাকে।

ঠ) সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব ঃ শহরাঞ্চলে সকলেই ব্যস্ত জীবন যাপন করে। ফলে চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী করে অনুভূত হয়। কিন্তু চিত্ত বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও সেরূপ সুযোগ খুবই কম থাকে। পর্যাপ্ত পার্ক, খোলা জায়গা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, অবসর কাটানোর বিশুদ্ধ পথ শহরে তেমন একটা পাওয়া যায় না। এমনকি গল্প-গুজরেব জন্য সঙ্গী পাওয়াও দুষ্কর হয়। ফলে চিত্ত বিনোদনের অভাব মানুষকে অবসন্ন, বিষন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

এছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদির অভাব নগরায়নের অন্যতম সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে বিদ্যমান।

৬.০ নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ দূরীকরণে কতিপয় সুপারিশ

৬.১ Gopal Bhargava কর্তৃক সম্পাদিত "Urban Problems and policy " নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,

" Urbnaization and technoligical transformation are two key processes of development if properly directed: otherwise social diosorder will come. This will help adopt comprehensive policy framework in regard to urban land, housing, transformation and balanced urban and regional development with a perspective of tomorrow."

উন্নয়নের প্রয়োজনেই নগরায়ন প্রক্রিয়া অপুরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি দেশের জন্য আশীর্বাদ বিবেচিত না হয়ে অভিশাপ বলে বিবেচিত হয়। তাই পরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে সুযোগ সুবিধার বিস্তৃতি ঘটিয়ে নগরায়নের দুরন্ত বেগকে প্রশমিত করা।

৬.২ গ্রামাঞ্চলে কতিপয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

গ্রাম এলাকায় রাস্তা, ওভারব্রীজ, কালভার্ট, গার্মেন্টস শিল্প নির্মাণ করে রুজি রোজগারের তথা কর্ম সংস্থানের পথ করে দিতে হবে (শাসনতন্ত্রের ১৬ অনুচ্ছেদ)। বাস, ট্রাক, ইটখোলা, দোকান পাটের মালিকানা গ্রাম এলাকার লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। গ্রামে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করতে হবে। সিনেমা হল, খেলার মাঠ প্রভৃতি সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। বেকারদের জন্য হাঁস-মুরগী গবাদি পশু, মৎস খামার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান, আয় এবং পরিণত বয়সে বিয়ে করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাম্য যুবকদের মনে নির্মল আনন্দ দান করে নৈরাশ্য দূর করতে হবে এবং কাজের স্থান সৃষ্টি করে ভবঘুরে পাগল হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে। পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা ও সেশন জটের অবসান ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পর কারিগরী শিক্ষা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৩ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের নগরমূখী অভিগমনের মাধ্যমে নগরায়নের বিস্তৃতি চূড়ান্তভাবে রোধ করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই নগরজীবনকে পরিকল্পিত ও উন্নততর করে দুঃসহ সমস্যাসমূহের অবসান যতটা সম্ভব ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ এখানে পেশ করা হলো ঃ

ক) প্রতিটি শহরের রাস্তাঘাট, পয়:প্রণালীর উন্নতি ঘটাতে হবে। ওয়ান-ওয়ে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ট্রাফিক জ্যাম কমাতে হবে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও ড্রেন উপচে পড়া রোধ করতে হবে।

খ) আবাসিক, অফিস-আদালত ও শিল্প কারখানার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। এতে আবাসিক এলাকায় শান্তি রক্ষা এবং শিল্প-কারখানার গতিময়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গ) অধিক কল-কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণকে ব্যক্তি মালিকানায় কল-কারখানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ফলে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে, অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে।

ঘ) পরিবেশ দুষণ রোধের জন্য বেশী করে গাছপালা রোপণ, যানবাহনের ফিটনেস কঠোরভাবে চেক করে দুষিত বায়ু নির্গমন রোধ করতে হবে।

ঙ) মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে পতিতাবৃত্তি বন্ধকরণ এবং তাদের জীবন ও জীবিকার সম্মানজনক পথ করে দিতে হবে।

চ) সেশনজট কমিয়ে এবং অসুস্থ ছাত্র রাজনীতি হ্রাস করে যুবকদেরকে কর্মক্ষম ও সুন্দরজীবন সৃষ্টির পথ করে দিতে হবে।

ছ) চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রতিটি এলাকায় বড়দের ও শিশুদের জন্য পার্ক নির্মাণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মিলনায়তনসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। এ বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর সার্বিক অবদান রাখতে পারে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) প্রতিটি মহল্লায় সরকারী উদ্যোগে পাঠাগর স্থাপন করে অবসর সময় কাটানো ও জ্ঞানচর্চায় সকলকে আগ্রহী করতে হবে। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সবক'টি সরকারী কলেজে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে যুবকদের উচ্চশিক্ষার মানসিকতা বাধাগ্রস্ত না হয়। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ঞ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যবস্থার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা না গেলে নগরায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়ে যাবে।

ট) মাদকদ্রব্য বিক্রি ও সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং অমাণ্যকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ঠ) চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করতে হবে। দরিদ্রদের জন্য সরকারী হাসপাতাল-গুলোকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে হবে।

ঙ। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এগুলোর অপচয় ও অবৈধ সংযোগ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঢ) মহল্লায় মহল্লায়, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন ও পরিচিতির নৈকট্য সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে বহু ছোট-খাটো অপরাধ ও মনোমালিণ্য সমঝোতা ও শালিসের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ন) সর্বোপরি সকল প্রকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানী দূর করার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে নগর জীবন কলুষ মুক্ত হবে, নগরায়ন প্রক্রিয়া সার্থকতা লাভ করবে।

৭.০ উপসংহার

৭.১ নগারায়নের ফলে সৃস্ট সামাজিক বন্ধন ও আন্তরিকতাহীন পরিবেশ দেখে জনৈক কবি অত্যন্ত মর্মপীড়ায় লিখেছিলেন "দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লও হে নগর"।

৭.২ নগরায়নের ফলে যদি মানুষগুলো যন্ত্র বনে যায়, মানবতা যদি কেঁদে ফেরে, সবাই যদি একক সত্তা হিসেবে পৃথক পৃথক জীবন যাপন করে, তাহলে মানবজীবন মরুময় হয়ে ওঠে। বর্তমান নগরায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং সমস্ত দেশে তা সরবরাহের কেন্দ্রবিন্দুরূপে দায়িত্ব পালন। অবশ্য প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও তার দায়িত্ব অপরিসীম। অথচ নগরসমূহে বাসবাসকৃত মানুষগুলা যদি উন্নত জীবন যাপনের ন্যূনতম সুযোগ না পায়, তাহলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে। তখন 'অরণ্যে' বাস করা সত্যি সত্যিই উত্তম বিবেচিত হবে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে আজ রাতারাতি পরিকল্পিত নগরায়ন আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশের সময় নেই নগরসমূহকে সমস্যায় নিমজ্জিত রেখে নগরায়নের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে ক্রমাগত পশ্চাদপদতার উদাহরণ সৃষ্টি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার।

গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো *'আদম শুমারীর প্রাথমিক রিপোর্ট' ৯ই জুলাই,* ১৯৯১

২। বাংলাদেম পরিসংখ্যান ব্যুরো *'আদম শুমারী,* ১৯৮১, প্রকাশ-১৯৮৩।

৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো *'পরিসংখ্যান বর্ষ-গ্রন্থ'* ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৩

৪। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার *'বাংলাদেশের সংবিধান'* ১৯৭২।

৫। Bhargava, Gopal (ed). *"Urban problems and policy persp:ctive"* Sakti Malik Abhinav Publications, New Delhi.

৬। Bangladesh Urban Studies *"Urbanizatias : Today's Thinking"* Dhaka-1990

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

গোলাম মোস্তাকীম *

১.০ ভূমিকা

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে সেই দেশের জনসাধারণ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নানা রকমের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তার সফল ব্যবহারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজন। একটা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। এবং এই উন্নয়নের পথে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূর করতে হবে।

১.১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কি?

প্রায় সকল মানব শিশুই কিছু সহজাত ও সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানব শিশুর এই সহজাত ও সুপ্ত ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যই তা করতে হবে। কেউ যেন এ সুযোগ থেকে অকারণে বঞ্চিত না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১.২ ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে এবং বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই যে জীবনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধায় জন্মগত অধিকার আছে তার সর্বজনীন স্বীকৃতিই হল মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি (UNDP Human Development Report 1994, P.13)

১.৩ এম, এম, ভের্মা বলেছেন "একটি সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development, M. M. Verma, P.14)

১.৪ আবার ফ্রেডেরিক এইচ, হারবিসন আরও জোর দিয়ে বলেছেন, "মূলধন, আয় এবং ভৌত সম্পদের কোনটাই একটা জাতির সম্পদ নয়। শুধুমাত্র মানব সম্পদই একটি জাতির আসল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়" (ঐ, পৃ: ১৯২)।

২. মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায়

২.১ দেশের আপামর জনসাধারণকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত

---

* সিনিয়র এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

পদক্ষেপসমূহ নেয়া প্রয়োজন ঃ

ক) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঃ দেশের সকল অনুর্ধ্ব ১০ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়ের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিখ্যাত আরবী প্রবাদে আছে, "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করা হলে শুধুমাত্র একজন লোককেই শিক্ষিত করা হয়। একজন মহিলাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা হয়। তারপরেও আমরা ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে হেরফের করে থাকি। সকল ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে সব সময়ই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

খ) বয়স্ক নিরক্ষরতা ঃ আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৪% ভাগ। দেশে বয়স্ক পুরুষদের চেয়ে বয়স্ক মহিলাদের নিরক্ষরতার হার বেশি। এটা যে কোন ভাবেই কমিয়ে আনতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে বয়স্ক মহিলাদের নিরক্ষরতার হার কিছুতেই যেন বয়স্ক পুরুষদের চেয়ে বেশি না হয়।

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ নানা কারণে আমাদের দেশের লোকজন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। অনেক জায়গায় কোন ডাক্তার নেই, অর্থাভাবে অনেকেই ডাক্তার দেখাতে পারেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গমতার কারণে অনেক রোগীই হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন না। দেশের সকল লোকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশেষ করে শিশুদের মারাত্মক ৬ টি রোগের জন্য প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) অপুষ্টি ঃ অপুষ্টি আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা। এ অপুষ্টির কারণে একটি মানব শিশুর মস্তিষ্ক পরিপূর্ণভাবে গঠিত হতে পারে না। এ অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে সমাজের বোঝা হিসেবে দেখা দেয়। এই অপুষ্টি দূর করতে হবে।

ঙ) পরিবার পরিকল্পনা ঃ জনসংখ্যাকে আমাদের দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে পরিবার পরিকল্পনার উপর কার্যকর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম দেশের সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে এবং সক্ষম ও ইচ্ছুক দম্পতিদের সকলেই যাতে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

চ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ঃ আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে ঃ 'জন্মসূত্রেই আমরা পেটের রোগ পেয়ে থাকি'। মূলত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই পেটের পীড়ায় ভুগে থাকে। এর অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ পানির অভাব। তাছাড়া অভ্যাসের কারণে আমরা অনেকেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করি না। এতে নানা রোগ ছড়ায়। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ

নিশ্চিত করতে হবে এবং শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারের প্রসার ঘটাতে হবে।

ছ) সবার জন্য ঋণ সুবিধা ঃ আমাদের দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১% ভাগ সরকারী চাকরি করে থাকে। সঙ্গত কারণেই সকলকে সরকারী চাকরি দেয়া সম্ভব নয়। এবং এই সকল লোকের জন্য কর্মসংস্থান তথা আত্মকর্ম-সংস্থানের জন্য ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই ঋণ যাতে সহজ শর্তে এবং দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যদি শুধু কথায়ই বলা হয়, সবাইকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তার জন্য কোন সাহায্য না করা হয় তাহলে সেটা কাজের কাজ হবে না।

২.২ মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) নিম্নরূপ চার্টার ঘোষণা করেছে ঃ

২.৩ A World social charter

WE THE PEOPLE OF THE WORLD SOLEMNLY PLEDGE to build a new global civil society, based on the principles of equality of opportunty, rule of law, global democratic governance and new partnership among all nations and all people (UNDP P.6)

২.৪ উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে একটি সিভিল সমাজ গঠন করতে হবে, এবং সে সমাজের ভিত্তি হবে সুযোগের সমতার নীতি, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক সরকার এবং সমাজের সকল লোকের মধ্যে একটি নতুন অংশীদারিত্ব।

৩.০ মানব সম্পদ-এর বর্তমান অবস্থা

৩.১ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি লাভ করে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী বাংলাদেশের অনেক কল-কারখানা নষ্ট করে ফেলে, অনেক কলকারখানার দামী যন্ত্রাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। অবাঙালী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক সঙ্কট দেখা দেয়। তাছাড়া ১৯৭৪ সালে খনিজ তেলের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে। সরকার তার সীমিত সম্পদ ও লোকবল নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়। তারপর গত ২১ বছরে দেশে মাত্র ৬ বছরের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করে।

৩.২ শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কখনই বড় হতে পারে নি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাঞ্জাবীদের বিরূদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে শিক্ষার জন্য সমান বরাদ্ধ দেয়া হয় নি। যদিও গত ২৫ বছরে শিক্ষাখাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

সারণী-১

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু তথ্য

	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
প্রাথমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪৯৯৬৮	৪৯৯৪২	৯৫৮৮৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা)	৯৮৯২	১১০৯৫	–
মাদ্রাসা (সংখ্যা)	৬২০৫	৬১৭৯	৬১৭২
মহাবিদ্যালয়, সাধারণ (সংখ্যা)	১০৪৬	৯৮৯	–
সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	১৩	১৩	১৩
বেসরকারী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪	৪	৪
ডেন্টাল কলেজ (সংখ্যা)	১	১	১
প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪	৪	৪
বিশ্ববিদ্যালয়	১১	১১	১১
বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সংখ্যা)	৬	৬	৬
% হিসেবে অংশ গ্রহণের হার	**১৯৯২**	**১৯৯৩**	**১৯৯৪**
প্রাথমিক (৫-৯ বৎসর)	৯৭.৫	৭৫.০	৯৫.০
মাধ্যমিক (১০-১৪ বৎসর)	৩০.৩	৩২.১	–
উচ্চ শিক্ষা (১৫-২৪ বৎসর)	৬.৯	৬.৭	৬.০
বিশ্ববিদ্যালয় সার্বক্ষণিক ছাত্র			
সর্বমোট	৫২৭২২	৬৩০০৬	১১৭৩৫৯
পুরুষ	৪০৬৮৩	৪৮৩৮১	৮৯৭৯৯
মহিলা	১২০৩৯	১৪৬২৫	২৭৫৬০
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	**১৯৯২**	**১৯৯৩**	**১৯৯৪**
প্রাথমিক	৬৬	৬৩	৫৪
মাধ্যমিক	৩৪	৩৩	–
মহাবিদ্যালয়	৩৪	৩৮	–
বিশ্ববিদ্যালয়	১৬	১৭	৩২
শিক্ষার জন্য ছাত্র প্রতি খরচ (টাকায়)	**১৯৯২**	**১৯৯৩**	**১৯৯৪**
প্রাথমিক	৪৯৩	৫৬৭	৪৭৫
মাধ্যমিক	১০৩৩	১৬৩৮	–
কলেজ	১০১৪	১১৪৬	–
বিশ্ববিদ্যালয়	২২২০৫	২২৯৫৮	১১৫০৩
শিক্ষার জন্য সরকারি রাজস্ব খরচ (কোটি)	১৩৬০	১৩৭৪	১৮২৪
শিক্ষার জন্য সরকারী উন্নয়ন খরচ	২৪৬	৫৯৩	৮৯২
শিক্ষার জন্য খরচ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	১৬০৬	২২৬৭	২৭১৬
জনপ্রতি শিক্ষার জন্য সরকারি খরচ	১৪৪	২০০	২৩৫

সূত্র ঃ Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৩ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে ৫৪ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালে ১৭জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৩২০ এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে উপজেলা প্রশাসন সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করে। কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, অধিকাংশ নিয়োগের ক্ষেত্রেই যোগ্যতা বিচার্য বিষয় ছিল না। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মীয়তা ও রাজনৈতিক আনুগত্যই নিয়োগের প্রধান মাপকাঠি ছিল। এই অনিয়মের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে বলে অনেকে মনে করেন।

৩.৪ ১৯৯৩ সালে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য ৫৬৭ টাকা ব্যয় হত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই ব্যয় ছিল ২২৯৫৮ টাকা। এতে সমাজের সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্য ক্রমাগত বৈষম্য বাড়তে থাকে। কারণ উচ্চ শিক্ষা সুবিধাভোগী সমাজের ছেলে-মেয়েরা অধিক হারে গ্রহণ করে থাকে।

সারণী-২

পেশাভিত্তিক কলেজ এবং ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা

	১৯৯২-৯৩			১৯৯৩-৯৪		
প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ছাত্র	শিক্ষক	কলেজ	ছাত্র	শিক্ষক
মেডিকেল	১৭	৯৯৩৯	১১৫২	১৭	৮৫২২	১০৫৪
ডেন্টাল	১	৩৩০	৪৯	১	৪১০	৫১
প্রকৌশল	৪	২৯১৭	২২৪	৪	২৮৯৩	২৩৯
পলিটেকনিক	১৮	১০৩৫৭	৮৮৪	২০	১০৫৬৫	৮৮৪
আইন	৩২	১৩৫৩৪	২৮৩	৩২	১৫০৮৭	২৯৫
কৃষি	৩	১১০১	১২৮	৩	১১১৫	১২৮
চারু ও কারুকলা	১	৬২২	৩৮	১	৭৫০	৩৮
গার্হস্থ্ অর্থনীতি	১	৩৫০০	৪৮	১	৩৫০০	৪৮
সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা	১	৬২৫	১৬	১	৬৬১	১৫

বিঃ দ্রঃ ১৭টির মধ্যে ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

সূত্র ঃ (১) ব্যানবেইস (২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, অর্থ মন্ত্রণালয় (৩) চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যলয়ের (৪) গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয় ও সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষগণ।

সূত্র ঃ Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৬ পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয় যেমন চিকিৎসা, প্রকৌশল ও পলিটেকনিকেলের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ দেশের চাহিদা ছাড়াও বিদেশে বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের আরও কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের প্রয়োজন। এই সকল দক্ষ লোক বিদেশ থেকে আমাদের দেশের জন্য

বহু প্রত্যাশিত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারেন, যা পরে আমাদের দেশে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপনে সহায়ক হতে পারে।

৩.৭ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপায় হল দেশের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকের বিশেষ অভাব দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে।

সারণী-৩

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ইনষ্টিটিউট ও ছাত্র সংখ্যা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (মাধ্যমিক) ছাত্র/ছাত্রী					প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) ছাত্র/ছাত্রী			
সাল	কলেজ	পুরুষ	মহিলা	মোট	প্রতিষ্ঠান	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৮৫-৮৬	১০	২৫৫০	৯৫০	৩৫০০	৫১	৬৪৫৩	১৮৫০	৮৩০৩
১৯৮৬-৮৭	১০	২৬১৫	১০০৯	৩৬২৪	৫১	৪৬৭৫	৩৭২৫	৮৪০০
১৯৮৭-৮৮	১০	২৫৮৪	১০৪০	৩৬২৪	৫৩	৩২৮৬	৪৪৩৯	৭৭২৫
১৯৮৯-৯০	১০	২৪৪৪	১৩৪২	৩৭৮৬	৫৩	৩১৪৪	২৪১৭	৫৫৬১
১৯৯০-৯১	১০	২৪৪৪	১৩৪২	৩৭৮৬	৫৪	-	-	৫০১০
১৯৯২-৯৩	১০	২৯৮৩	১৪৬৯	৪৪৫২	৫৪	২৬৬২	২৩৪৮	৫০১০
১৯৯৩-৯৪	১০	৩২৭১	১৪৫৮	৪৭২৯	৫৪	১৫৯৫	১৭০০	৩২৯৫

সূত্র ঃ ব্যানবেইস ২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, অর্থ মন্ত্রণালয়, Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৯ উল্লখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে গত দশ বছরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯৯৬৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪সালে ৯৫৮৮৬ তে দাঁড়িয়েছে। গত দশ বছরে পিটিআই-এর সংখ্যা মাত্র ৩টি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই অপ্রতুল।

৩.১০ মাদ্রাসা শিক্ষা

বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কিছু বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজী ও বিজ্ঞান বিষয়ক কোন কোন বিষয় সংযোজন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার হাজার

হাজার এবতেদায়ি মাদ্রাসার মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করে প্রতি ইউনিয়ন থেকে একটি করে মাদ্রাসা নির্বাচন করার প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচিত এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা পাবেন।

সারণী-৪

ছাত্র শিক্ষকসহ মাদ্রাসার সংখ্যা

মাদ্রাসার ধরন	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩
	(মাদ্রাসার সংখ্যা)		
দাখিল	৪৩৩৩	৪৪৬৬	৪৩৮৮
আলিম	৭৮৮	৮২১	৮২৭
ফাজিল	৮০৭	৮২২	৮৫৮
কামিল	৯৪	৯৬	৯৬
মোট	৬০২২	৬২০৫	৬১৭৯
	শিক্ষকের সংখ্যা		
দাখিল	৫৬৯২৯	৫৮০৫৮	৫৭০৪৪
আলিম	১৬৫৪৮	১৭২৪১	১৬৫৪০
ফাজিল	২২৫৯৬	১৭২৬২	১৭১৬০
কামিল	৩১০২	২৪০০	২২৬৩
মোট	৯৯১৭৫	৯৪৯৬১	৯৩০০৭
	ছাত্র সংখ্যা (হাজার)		
দাখিল	১০৮৩	১১১৭	১০৯৭
আলিম	২৩৬	২৪৬	২৪৮
ফাজিল	৩২৩	৩২৯	৩৪৩
কামিল	৪২	৪৩	৪৩
মোট	১৬৮৪	১৭৩৫	১৭৩১

সূত্র ঃ (১) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, অর্থ মন্ত্রণালয় (২) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (৩) বিবিএস, ১৯৯৬ (পৃঃ ৩০৩)

৪.০ বয়স্ক শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাধারণ শিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং বয়স্ক নিরক্ষতার হার কমাতে হবে। বয়স্ক নিরক্ষরতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়েছে এবং দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫.০ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

৫.১ একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গত কয়েক বছরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ৬টি মারাত্মক রোগের জন্য শিশুদের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচি বেশ সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়েছে।

সারণী-৫

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য

	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
হাসপাতালের সংখ্যা	৮৯০	৮৯০	৯০৬	৯১৯
সরকারি হাসপাতাল	৬১০	৬১০	৬১১	৬৩৯
বেসরকারি হাসপাতাল	২৮০	২৮০	২৯২	২৮০
সরকারি ডিসপেন্সারী	১৩১৮	১৩৬২	১৩৯৭	১৩৯৭
মোট হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা	৩৪৩৩৫৩	৩৪৩৩৫৩	৩৫২৮০	৩৫৭৯৫
সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীতে শয্যা সংখ্যা	২৭১১১	২৭১১১	২৭৬৩৭	২৮৫৫৩
বেসরকারি হাসপাতাল	৭২৪৩	৭২৪২	৭৬৪৩	৭২৪২
শয্যা প্রতি লোকের সংখ্যা	৩১৮৯	৩২৪৩	৩২০৮	৩২৮৮
রেজিষ্ট্রিভুক্ত ডাক্তার	২০৩৭১	২১০০৪	২২৪০০	২৪৯১১
ডাক্তার প্রতি লোকের সংখ্যা	৫৩৮০	৫৩০৪	৫০৫৪	৪৭২৫
রেজিষ্ট্রিভুক্ত নার্সের সংখ্যা	৯৬৫৫	১০৬০৭	৯৪৫৫	৯৬৩০
রেজিষ্ট্রিভুক্ত দাই-এর সংখ্যা	৭৭১৩	৯৩৬৩	১০১০৪	৭৭১৩
যক্ষা ক্লিনিক	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬
স্বাস্থ্য কর্মী	৮১৭৪৪	৮১৭৪৪	৭৭২০৯	৭৫৫৬৭
সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৮	১৩	১৩	১৩
হোমিওপ্যাথিক কলেজ	২২	২২	২১	২১
ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান	১৯৮	২০৭	২০৮	২০৮
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান	৫৮	৬৫	৬৬	৬৯
ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান	৪০৫	৩৯০	৪৩২	৪১১
গড় আয়ু পুরুষ ও মহিলা (মোট)	৫৬	৫৬	৫৮	৫৮
পুরুষ	৫৭	৫৭	৫৮	৫৮
মহিলা	৫৬	৫৬	৫৮	৫৮
জন্মহার	৩১.৬	৩০.৮	২৮.৮	২৮.৮
মৃত্যুহার	১১.২	১১.০০	১০.০	৯.০
শিশু মৃত্যুহার পুরুষ ও মহিলা	৯২	৮৮	৮৪	৭৭
স্বাস্থ্য ও পরিঃ পরিকল্পনার উপর সরকারি ব্যয় (কোটি)	৬৯৮	৬৮৪	১১২৮	১৩২৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার পকিল্পনার খাতে জনপ্রতি সরকারি ব্যয় (টাকা)	৬২	৬১	১০৭	১১৫

সূত্রঃ Statistical pocktbook 95, P.310

উল্লিখিত সারণী থেকে দেয়া যায় যে, বাংলাদেশে ৪৭২৫ জন লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার এবং সারা দেশের জন্য রেজিষ্ট্রার্ড নার্সের সংখ্যা মাত্র ৯৬৩০জন। এই দুটো সংখ্যাই প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তবে একটা ভাল দিক হল এই যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ১৯৯১ সালে বরাদ্দকৃত ৬৯৮ কোটি টাকা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ১৯৯৪ সালে ১৩২৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর পরিমাণ ১৯৯৬-৯৭ সালে বাড়িয়ে ১৬২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

৫.২ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৫ বছরের মধ্যেও আমরা কোন স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এর জন্য আমরা সকলেই দায়ী। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন বলে সবাই প্রত্যাশা করেন।

৫.৩ পরিবার পরিকল্পনার কিছুটা অগ্রগতি হলেও তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়ে বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

সারণী-৬

সরকারি কর্মসূচির অধীনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।

বৎসর	ক্লিনিকাল (সংখ্যা)*	কনডম	নন-ক্লিনিকাল ওরাল পিল (০০০ সাইকল)	এমকো (ভাইয়ালস)
১৯৮৮-৮৯	১২৪২০০০	১৫৪১২	২৪৬২৩	৮০০০
১৯৮৯-৯০	১৯৪১০০০	১৬৫০০	৩৪৩৪৫	৪০৩৩
১৯৯০-৯১	২৪১৯০০	১২২০০	৪৬৭৮৪	৪৭২৫
১৯৯১-৯২	২৭৬৯৬৭৩	১৩২৯২	৪৫৬৩২	২১৬৬
১৯৯২-৯৩	২৯২১২৯৬	১৮৬৮৬	৬৩৯১৮	৭৬৫
১৯৯৩-৯৪**	১৪৫৯৫০৫	৬৭১৫	২৭৮৯৮	৬৫৩

* আইইউডি, ভেসেকটমি, টিউবেকটমি, ইনজেকশন, এম, আর, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

** সাময়িকী

সূত্র ঃ- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। বিবিএস, ১৯৯৬ (পৃঃ ৩১১)।

৫.৪ অপুষ্টির কারণে আমাদের দেশের শিশুরা নান রোগে ভুগে থাকে। তাছাড়া ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দান কর্মসুচি বিদেশী সাহায্য সংস্থার আর্থিক অনুদানে চালু

করা হয়েছে। এতে দেশে শিশু মৃত্যুর হার কমে আসছে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি প্রায়ই প্রচার করা হয়ে থাকে।

সারণী-৭

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য টিকাদান কর্মসূচি (শতকরা হারে)

টীকা	দাগ	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
		মোট	মেয়ে	ছেলে	মোট	মেয়ে	ছেলে
ডিপিটি এবং পোলিও	১ম দাগ	৮১.৮	৮০.০	৮৩.৪	৮৬.৭	৮৫.৫	৮৭.৫
	২য় দাগ	৭৬.২	৭৫.২	৭৭.২	৮৮.৮	৮৫.৯	৯১.২
	৩য় দাগ	৭৩.৯	৭৩.০	৭৪.৪	৮১.৪	৭৮.৭	৮৩.৭
হাম		৭২.৩	৭৩.২	৭৩.২	৭৬.৫	৭৩.৯	৭৮.৭
বিসিজি		৬৯.১	৬৮.৯	৭৩.৬	৭৬.৭	৭৫.০	৭৮.১
ধনুষ্টংকার (গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী মাতা)	১ম দাগ	৭১.৮	৭৩.০	৭০.৭	৭৪.৫	৭৬.৩	৭৩.৩
	২য় দাগ	৫৩.৩	৫৪.৮	৫১.৮	৬২.৬	৬২.১	৬৩.৩

সূত্রঃ- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ, মে, ১৯৯৪। (বিবিএস পৃঃ ৩১৩)।

৫.৫ **উল্লিখিত** সারণী থেকে দেখা যায় যে, টিকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার সব সময়ই কম। শুধুমাত্র ধনুষ্টংকার এর ক্ষেত্রে মেয়েদের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। আর একটা বিষয় বেশ খেয়াল করার মত; গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ধনুষ্টংকার-এর দ্বিতীয় দাগ গ্রহণ করার মাত্রা বেশ কম। গ্রামাঞ্চলে এর মাত্রা ৫৩.৩% ভাগ এবং শহরাঞ্চলে মাত্র ৬২.৬ ভাগ।

৬.০ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের অধিকাংশই রোগই হয়ে থাকে দুষিত পানির কারণে এবং অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার জন্য। বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ জনসাধারণ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থার উন্নয়ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৭.০ ঋণদান কর্মসূচি

সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট আয় উৎপাদক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে এ ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান

ও খ্যাতি অর্জনে সহায়তা করেছে। পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ড তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের প্রচুর অবকাশ রয়েছে।

৮.০ জনশক্তি, শ্রমশক্তি ও কর্ম সংস্থান

৮.১ বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিখাত থেকে জিডিপির শতকরা ৪৬ ভাগ আয় হয়। দেশের ৯০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং সঙ্গত কারণেই অপুষ্টি, উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার ও অনুৎপাদনশীলতায় ভোগে। লোক সংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের কারণে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে এবং এ সকল ভূমিহীন লোকজন শ্রম বাজারে একটি অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করছে। কারণ শ্রম বাজার যা ইতোমধ্যেই ভীড়াক্রান্ত এ সকল অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে গ্রহণ করতে পারছে না। বাংলাদেশে শিল্প খাতে বৃদ্ধির গতি শ্লথ এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত এই বাড়তি শ্রম শক্তি দেশে বেকারত্ব এবং আধা-বেকারত্বের সৃষ্টি করছে।

৮.২ বাংলাদেশে গ্যাস এবং পাথর ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ থেকে সাধারণত কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া মাছ এবং তৈরি পোষাক রপ্তানী করা হয়ে থাকে। এছাড়া দক্ষ জনশক্তিও বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। (হক, ১৯৯৪ পৃঃ ২৯)

সারণী-৮

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

অঞ্চল	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
জাতীয়	**২.১৬**	**২.১৫**	**২.০৬**	**১.৯৮**	**১.৮৮**	**১.৮৮**
শহরাঞ্চল	**১.৭১**	**১.৬৭**	**১.৬০**	**১.৫৮**	**১.৪৯**	**১.৩৮**
গ্রামাঞ্চল	২.২৪	২.২৩	২.১৮	২.০৫	১.৯৫	১.৯৮

সূত্র ঃ Statistical pocketbook of Bangladesh 95 (p.125)

৮.৩ উল্লিখিত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৯০% লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে।

সারণী-৯

প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার (১০০০ জীবন্ত শিশুর জন্য)

বৎসর	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৮৮	৫.৭	৬.০	৫.৬
১৯৮৯	৫.১	৫.৮	৪.৬
১৯৯০	৪.৮	৫.০	৪.৩
১৯৯১	৪.৭	৪.৮	৪.০
১৯৯২	৪.৭	৪.৮	৪.০
১৯৯৩	৪.৫	৪.৭	৩.১
১৯৯৪	৪.৫	৪.৬	৩.৯

সূত্র ঃ Statistaical pocketbook of Bangladesh 95 (p.125).

৮.৪ শ্রমশক্তি ও কর্ম সংস্থান

আমাদের দেশের শ্রমশক্তির এক বিপুল অংশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এ ছাড়া শ্রমশক্তির অনেকাংশই আধা-বেকারত্বে ভুগে থাকে। গ্রামাঞ্চলে যারা কৃষির সঙ্গে জড়িত থাকে তারা সংবৎসর কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া মহিলারা যে কাজ করে তার কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়ন আমাদের দেশে এখনও করা হয় না। অবিবাহিত মেয়েরা সাংসারিক কাজে মায়েদের সাহায্য করে থাকে, বাড়ীর বৃদ্ধদের সেবা করে এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করে। উপরন্তু তারা হাঁস-মুরগি পালন করে, বাড়ির উঠানে শাক-সব্জির বাগান করে, দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে দূরের মাঠে কর্মরত পিতা ও ভাইদের খাবার নিয়ে যায়। ফসল কাটার সময় গ্রামের নারীরা পুরুষদের সাহায্য করে থাকে। এসব কর্মকান্ডকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে প্রচলিত ঐতিহ্য হিসেবে দেখা হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কান্ডে নারীদের অবদান স্বাভাবিকভাবে খাটো করে দেখা হয়।

সারণী-১০
শ্রম ও জনশক্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বৈশিষ্ট্য		শ্রমশক্তি ১৯৮৫-৮৬	শ্রমশক্তি ১৯৮৯	শ্রমশক্তি ১৯৯০-৯১
১। মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)				
	পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
	মহিলা	৩.২	২১.০	২০.১
	মোট	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২। সক্রিয় বেসামরিক শ্রমশক্তি (কর্মরত, মিলিয়ন)				
	পুরুষ	২৭.৪	২৯.৪	৩০.৫
	নারী	৩.১	২০.৭	১৯.৭
	মোট	৩০.৫	৫০.১	৫০.২
৩। বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		০.৩	০.৪	০.৬
	পুরুষ	০.১	০.২	
	নারী			
	মোট	০.৪	০.৬	১.০
৪। বেসামরিক শ্রমশক্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় (মিলিয়ন)				
	গৃহিণী	২৪.০	১৮.২	৯.৬
	অন্যভাবে নিষ্ক্রিয়	১৪.৪	১.৯	১২.৮
	শিশু (০-৯ বৎসর)	৩১.৪	৩৭.৩	৩৫.৫
৫। বেকারত্বের হার (আধা-বেকারত্ব ব্যতীত)				
	পুরুষ	০.৮	১.৩	২.০
	নারী	৩.৩	১.০	১.৯
	মোট	১.০	১.২	১.৯
৬। শিশু শ্রমশক্তি (৫-১৪ বৎসর)				
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	২.৮	৬.১	৫.৪
	মোট শ্রমশক্তি % হার	৯.১	১২.২	১১.৩
৭। যুব শ্রমশক্তি (১৫-২৯ বৎসর)				
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১২.০	১৯.১	১৯.৮
	মোট শ্রমশক্তির % হার	৩৮.৮	৩৭.৭	৩৮.৭
৮। নারী শ্রমশক্তি সংখ্যা (মিলিয়ন)		৩.২	২১.০	২০.১
	মোট শ্রম শক্তির % হার	১০.৪	৪১.৪	৩৯.৩
৯। মূল খাত-ওয়ারী কর্মসংস্থান				
	কৃষি			
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৭.৫	৩৭.০	৩৪.৪
মোট শ্রমশক্তির % হার	৫৭.২	৭৩.৮	৬৮.৫	
	অকৃষি			
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩.১	১৩.২১	১৫.৮
	মোট শ্রমশক্তির % হার	৪২.৮	২৬.২	৩১.৫

সূত্র : Statistical Pocketbook of Bangladesh 95 (p.137).

৮.৫ ১৯৮৯ সালের জরিপে দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা যে ক্ষেতে কৃষি কাজ করে, ফসল কাটে, মাড়াই করে, গোলাজাত করে, শাক-সব্জীর চাষ ইত্যাদি করে- এসকল কর্মকান্ডকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করার ফলে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী শ্রমশক্তির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

সারণী-১১

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে জনসংখ্যা

অর্থনৈতিক বিভাজন	১৯৮৫-৮৬			১৯৮৯ (শ্রমশক্তি)			১৯৯০-৯১(শ্রমশক্তি)		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
				জাতীয়					
বেসামরিক শ্রমশক্তি	৩০.৯	২৭.৭	৩.২	৫০.৭	২৯.৭	২১.০	৫১.২	৩১.১	২০.৯
ক) কর্মরত	৩০.৬	২৭.৫	৩.১	৫০.১	২৯.৪	২০.৭	৫০.২	৩০.৫	১৯.৭
খ) বেকার	০.৪	০.৩	০.১	০.৬	০.৪	০.২	১.০	০.৬	০.৪
বেসামরিক শ্রঃ মধ্যে	৭০.৭	২৩.৯	৪৬.৬	৫৭.৪	-	-	৫৭.৯	২৬.০	৩১.৯
ক) গৃহিনী /খাবার কাজ	২৪.৯	-	২৪.৯	২০.১	-	-	৯.৬	০.১	৯.৫
ক) নিষ্ক্রিয়	৪৫.৮	২৩.,৯	২১.৯	৩৭.৩	-	-	৪৮.৩	২৫.৯	২২.৪
				শহরাঞ্চল					
বেসামরিক শ্রমশক্তি	৪.৬	৪.০	০.৬	৫.৭	৪.২	১.৫	৮.৭	৬.৬	২.১
ক) কর্মরত	৪.৬	৪.০	০.৬	৫.৫	৪.১	১.৪	৮.৪	৬.৫	১.৯
খ) বেকার	০.১	-	-	০.২	-	-	০.২	০.১	০.৯
বেসামরিক শ্রমশক্তি ভুক্ত নয়	৯.০	৩.৩	৫.৭	১০.৫	৪.১	৬.৪	১৩.৪	৫.৪	৭.৯
ক) গৃহিনী/খাবার কাজ	২.৫	-	২.৫	-	-	-	৩.২	৬.১	৩.৯
খ) নিষ্ক্রিয়	৬.৫	৩.৩	৩.২	৪.৯	২.৫	২.৪	১০.২	. ৫.৪	৪.৮
				গ্রামাঞ্চল					
বেসামরিক শ্রমশক্তি	২৬.৩	২৩.৭	২.৬	৪৫.১৬	২০.৬	১৯.৫	৪২.৫	২০.০	১৮.০
ক) কর্মরত	২৫.৯	২৩.৪	২.৫	৪৪.৬	২৫.৩	১৯.৩	৪১.৭	১৩.১	১৭.৭
খ) বেকার	০০.৩	০০.২	০.১	০.৪	-	-	০৮৮	০.৫	০.৩
বেসামরিক শ্রমশক্তি ভুক্ত নয়	৬১.৪	২০.৪	৪১.০	৪৬.৮	২১.৭	২৫.১	৪৪.৫	২০.৫	২৪.০
ক) গৃহিনী খানার কাজ	২২.৪	-	২২.৪	-	-	-	৬.৫	০.১	৬.৪
খ) নিষ্ক্রিয়	৩৯.০	২০.৪	১৮.৬	১৪.৪	৫.১	৯.৩	২৮.০	২০.৪	১৭.৩

সূত্র ঃ Statistical Poektlbook of Bagnladesh 95, 139

৮.৬ উল্লিখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে বেসামরিক শ্রমশক্তির মধ্যে শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ০.২ মিলিয়ন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যাই হল ০.৮ মিলিয়ন।

৮.৭ বাংলাদেশ নারী-পুরুষের পেশার মধ্যেও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লাভজনক, আরামদায়ক ও প্রশাসনিক পদে পুরুষদের সংখ্যা মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি। আবার কৃষি, বন ও মৎস্য ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি। ১২ নম্বর সারণী থেকে তা লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-১২

লিঙ্গ ও পেশা অনুসারে ১০ বৎসরের অধিক লোকসংখ্যার শতকরা বিভাজন

পুরুষ ও মহিলা			কর্মরত পুরুষ শ্রমশক্তি		কর্মরত মহিলা শ্রমশক্তি	
প্রধান পেশা মোট	মোট লোক সংখ্যার % ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ	মোট সংখ্যার %ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ	মোট সংখ্যার %ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ
পেশাভিত্তিক	৪৬.০	১০০	৫৩.৪	১০০	৩৭.৯	১০০
কারিগরি	১.৩	২.৯	২.০	৩.৭	০.৬	১.৭
প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	০.২	০.৪	০.৩	০.৬	০.১	০.১
করণিক	১.০	২.২	১.৮	৩.৪	০.১	০.৩
বিক্রয়	৩.৭	০	৬.৮	১২.০	০.২	০.৬
সেবা	১.৫	৩.৩	১.৬	২.৯	১.৫	৪.০
কৃষি, বন ও মৎস্য	৩১.৫	৬৮.৫	২৯.৮	৫৫.৮	৩৩.৪	৮৮.১
উৎপাদন ও যোগাযোগ	৬.৪	১৩.৯	১০.৫	১৯.৪৭	১.৮	৫.০
অন্যান্য	০.৪	০.৮	০.৬	১,১	০.১	০.২

সূত্র ঃ- Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.140.

৮.৮ নারী-পুরুষের মধ্যে পেশাভিত্তিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩ নম্বর সারণী থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পেশাভিত্তিক কর্মরত জনসংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়।

সারণী-১৩
১০ বৎসর-এর অধিক কর্মরত লোক সংখ্যার প্রধান পেশাভিত্তিক শতকরা হার; ১৯৯০-৯১

প্রধান পেশা	বাংলাদেশ	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০
পেশাভিত্তিক ও কারিগরি	২.৯	৫,৫	২.৪
প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা	০.৪	১.৫	০.১
করণিক	২.২	৭.৪	১.১
বিক্রয়	৮.০	১১.৯	৬.৪
সেবা	৩.৩	৮.৮	২.২
কৃষি, বন ও মৎস্য	৬৮.৫	২৭.৩	৭৬.৮
উৎপাদন ও যোগাযোগ	১৩.৯	৩২.৮	১০.১
অন্যান্য	০.৮	০.৮	০.৮

সূত্র ঃ- Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.141

৮.৯ গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান এবং যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে।

৯.০ তৈরি পোষাক শিল্পে নারীদের অবদান

৯.১ অন্যান্য উন্নয়শীল দেশের মত বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা তৈরি পোষাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ১৯৮১-৮২ সালে এই খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানির ১.১% ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ হয় ৫২% ভাগ। তৈরি পোষাক শিল্পের শতকরা ৮৪ ভাগ কর্মী মহিলা।

সারণী-১৪
তৈরি পোষাক শিল্পের ক্রমাগত সমৃদ্ধি, ১৯৮২-৯৩

বৎসর	বিজিএমইএতেরেজিষ্ট্রিভুক্ত/ বৎসর	ইউনিট মোট	মোট রপ্তানি (মার্কিন ডলার, মিলিয়ন)	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন)	মোট রপ্তানির % ভাগ
১৯৮১-৮২	-	-	৭.০	০.১	১.১
১৯৮২-৮৩	২১	২১	১০.৮	০.২	১.৬
১৯৮২-৮৪	২৫	৪৬	৩২.০	০.৭	৩.৮
১৯৮৪-৮৫	১৩৪	১৮০'	১১৬.০	২.৮	১২.৩
১৯৮৫-৮৬	৪০৭	৫৮৭	১৩১.০	৩.৬	১৬.০
১১৯৮৬-৮৭	১৪	৬০১	২৯৯.০	৮.০	২৭.৮
১৯৮৭-৮৮	৫৭	৬৫৮	৪৩৩.০	১২.৩	৩৫.২
১৯৮৮-৮৯	৫৪	৭১২	৪৭১.০	১৩.৭	৩৬.৬
১৯৮৯-৯০	২৫	৭৩৭	৬০৯.০	১৮.৭	৪০.০
১৯৯০-৯১	৪৩	৭৮০	৭৩৬.০	২৮.০	৪২.৮
১৯৯১-৯২	১৫৪	৯৩৪	১০৬০.০	৪০.৫	৫৩.৪
১৯৯২-৯৩	৪২০	১৩৫৭	১২৪০.৫	৪৬.২	৫২.০

সূত্র ঃ- The world Bank, 1995 (p.77)

৯.২ তৈরি পোষাক শিল্পের অধিকাংশ কর্মীই আসে গ্রামাঞ্চল থেকে এবং শহরে তাদের কর্মস্থলে নানা প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করে তারা এই গত ১২ বছরে এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তাদের কিছু সমস্যা যেমন, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, বিবাহিতা মহিলাদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর প্রতি কার্যকর দৃষ্টি দেয়া হলে এ শিল্পের আরও প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে।

১০.০ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, দেশে সিভিল সমাজ গঠন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শহর ও গ্রামের মধ্যে নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে এবং দেশের সকল স্তরে নারী-পুরুষদের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। এশিয়ার সদ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ (Newly Industriealised Countries, NICs) এর মত এই পন্থা অবলম্বন করেই সফলতা লাভ করতে হবে। তারপর আরও একটি বিষয় রয়েছে; আমাদের কালচারের বৈশিষ্ট্য হল, আমরা আত্ম-সমালোচনা না করে অন্যের সমালোচনা করি। এতে সমাজের কোন উপকার হয় না। আমি নিজেকে শোধরাতে পারি যদি আমি চেষ্টা করি। কিন্তু যেখানে উপদেশ ও সমালোচনার সরবরাহ সীমাহীন, সেখানে চাহিদা থাকে না বললেই চলে।

১০.২ আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র ভুটান ও নেপাল মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে আছে। পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। ষাটের দশকের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা আমাদের মতই ছিল। এমনকি কোন কোন বিষয়ে সে দেশের অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ ছিল। সেই দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু জিএনপির পরিমাণ ৬৩৫০ মার্কিন ডলার। তাদের জনসাধারণের গড় আয়ু ৭০.৪ বৎসর আর আমাদের মাত্র ৫২.২ বৎসর। এমনকি পাশের দেশ ভারতের শিক্ষার হার শতকরা ৫০ ভাগ এবং আমাদের মাত্র ৩৪ ভাগ। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহ যে কৌশলে তাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন করেছে বাংলাদেশের সে ব্যাপারে অনেক কিছুই শেখার আছে। এ সম্পর্কিত কথা অনেক হয়েছে, এবার কাজের সময়।

সারণী-১৫
মানব উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

দেশ	গড় আয়ু (বৎসর)	মোট লোক সংখ্যার শতকরা হিসেবে সুবিধা ভোগ করে স্বাস্থ্য সেবা, বিশুদ্ধ পানীয়	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (জনসংখ্যার % হিসেবে)		প্রাত্যহিক ক্যালরী সরবরাহ (প্রয়োজনের %)	বয়স্ক শিক্ষার হার	বিভিন্ন স্তরে ভর্তির অনুপাত % হিসেব (৬-২৩ বৎসর)	জিএনপি মার্কিন ডলার
	১৯৯২	১৯৮৫-৯১	১৯৮৮-৯১	১৯৮৮-৯১	১৯৮৮-৯০	১৯৯২	১৯৯০	
নেপাল	৫২.৭	-	৪২	৮	১০৩	২৭	৪১	১৮০
ভূটান	৪৭.৮	৭০	৩১	৯	-	৪১	১১	১৯০
পাকিস্তান	৫৮.৩	৯০	৫৬	২৪	২০১	৩৬	২৪	৪০০
শ্রীলংকা	৭১.২	৯০	৭১	৬০	৯৯	৮৯	৬৮	৫০০
ভারত	৫৯.৭	-	-	১৫.	১০৫	৫০	৫০	৩৩০
বাংলাদেশ	৫২.২	৬০	-	৩২	৯৪	৩৭	৩২	২২০
দক্ষিণ কোরিয়া	৭০.৪	১০০	৯২	১০০	১২৩	৯৭	৭৪	৬৩৫০

সূত্র ঃ-Human Development Report 94, P.185

১০.৩ উল্লিখিত সারণী থেকে আমরা বাংলাদেশের অবস্থা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। শ্রীলংকা একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। ২৫ বছর ধরে সেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে এবং সর্বশেষ হিসেবে সে দেশের শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ। সেখানে সরকারি কর্মকর্তারা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীদের সহায়তায় এই সাফল্য অর্জন করেছেন।

১১.০ উপসংহার ও সুপারিশ

সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর। এদেশে গ্যাস ও পাথর ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও মানব সম্পদের কোন অভাব নেই। এই মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই এ দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

ক) দেশের সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য টিকার

ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য অধিকহারে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং চিকিৎসকদের মধ্যে সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

গ) সক্ষম সকল দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই কার্যক্রমের আরও বিস্তার ঘটাতে হবে।

ঘ) জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবস্থা করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ঙ) মারাত্মক অপুষ্টির মাত্রা কমাতে হবে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

চ) বয়স্ক নিরক্ষরতার হার কমাতে হবে। বয়স্ক নারীদের নিরক্ষরতার হার কিছুতেই যেন পুরুষদের চেয়ে বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছ) সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা বিশেষ করে কারিগরী শিক্ষায় মেয়েরা যাতে অধিকহারে শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করা যেতে পারে এবং অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

জ) সকল কর্মক্ষম লোকের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একজন যুবক কর্মক্ষম ও যোগ্যতা থাকার পরেও যদি কাজ পেতে ব্যর্থ হন তাহলে তার মধ্যে হতাশা আসতে বাধ্য। এবং এই হতাশাই তাকে নানা অন্যায় কাজে টেনে নিয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ছোট-খাটো ব্যবস্থা চালু করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল এবং এলাকাভিত্তিক বৈষম্য দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ) সারা বিশ্বে বর্তমানে চালু মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার করতে হবে।

ট) শ্রম বাজার-এর দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, অভিভাবক, ছাত্র শিক্ষকদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

ঠ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক করতে হবে।

ড) জনপ্রশাসনসহ সকল সরকারি কর্মকান্ডে সুস্থ জবাবদিহিতা ও প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য সমাজের সকল স্তরে একটি দক্ষ কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Strong political will) একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ সরকারি-বেসরকারি কর্মীদের কার্যকর দক্ষতা এবং সমাজের সকল স্তরের সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. UNDP, 1994, *Human Development Report 1994*, Oxford University Press, Delhi P. 6, 13, 185.
2. The World Bank, 1995, *Bangladesh:From Stabilisation to growth*, Washington D. C. P.77.
3. Bangladesh Bureau of Statistics, 1996, *Statistical Pocketbook of Bangladesh* 95, Dhaka. pp 124, 125, 126, 137, 139, 140, 144, 303, 310, 311.
4. The World Bank, 1993, *Poverty Reduction : Handbook*, Washington, D. C.
5. Mathur, B, L (Ed), 1989, *Human Resources Development, Strategic Approaches and Experiences*, Arihant Publishers, Jaipur (India)
6. Nadler Neonard and Nadler, Zeace, 1989, *Developing Human Resources*, Gesey-Bas publishers, London.
7. Kohli, Uddesh and Sinha, Dharani, P (Ed) 1994, *Human Reseurces Development* Allied Publishers Ltd. New Delli.
8. UNDP, 1995, 1995 *Report on Human Development in Bangladesh*, Susoma Printing, Dhaka.
9. UNDP, 1993, *Human Development Report 1993*, Oxford University Press, London..
10. Human Reseurces Development in South Asia (Ed) a1992, *The Much Taken For Granted Domain*, Asian and Pacific *Development* Centere, Kuala Lumpur.

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ,প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।

✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।

✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক, জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক, জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Coordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50